# অভিশপ্ত আত্মা

পৃথ্বীরাজ সেন

পরিবেশক

পূর্বাচল

৮২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯

প্রকাশক :

সৌমেন রায়

সন্তোষপুর, যাদবপুর

প্রথম প্রকাশ :

এপ্রিল ১৯৬৫

প্রচ্ছদ :

সুধাময় দাশগুপ্ত

মুদ্রক :

শ্রীজয়কৃষ্ণ ঘোষ

পাইওনীয়ার প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৪৭/এফ, শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট

কলিকাতা-৪

দূর আকাশের একটি তারা

অরুন্ধতীকে

পৃথ্বীরাজ

## অবচেতনার অন্ধকারে

—এসো, কাছে এসো।

লুসি চোখ তুলে তাকাল। টানা টানা দুটি চোখে অনন্ত জিজ্ঞাসা। সে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল। অদূরে দাঁড়িয়ে আছে এক রমণী মূর্তি, কালো বোরখা ঢাকা দেহ তার, মাথায় একরাশ সোনালী চুলের বন্যা। লুসি যেন আচ্ছন্নের মত হেঁটে চলেছে।

ঘরের মাঝখানে কাঠের দীপাধারে জ্বলছে একটি মাত্র প্রদীপ। চারপাশে ছড়ানো আছে মৃত মানুষের অস্থি-মজ্জা-হাড়। পচা দুর্গন্ধ ভরে রেখেছে বাতাসকে।

বাতাস বলতে খর তাপ ভরা রুক্ষতার হাওয়া। এই মরুভূমির দেশে এক বিন্দু বৃষ্টি নেই। এখানে শুধুই উন্মত্ত প্রখর সূর্যের হাহাকার।

লুসি ছায়ামূর্তির ঠিক সামনে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। তারপর চোখ বন্ধ করল। ছায়ামূর্তি এগিয়ে এসে তার হাত দুটো ধরে জোরে জোরে ঝাঁকাতে লাগল। মুখে উচ্চারণ করছে অব্যক্ত শব্দাবলী।

কোথাও কে যেন বিকট স্বরে হেসে ওঠে। লুসির মনে হল বন্ধ ঘরের মধ্যে বন্দী হাড়ের মিছিলে খটাখট শব্দ উঠেছে। হো হো করে হাসছে রাশি রাশি কঙ্কালের দল। তারা যেন কি বেদনার কথা শোনাবে লুসিকে।

কপালে ঘাম দেখা দিয়েছে তার, মনে হয় কেউ বুঝি সবল দুটি হাত দিয়ে তার গলা টিপে ধরেছে। ক্রমশঃ নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে [illegible] আর বাঁচবে না।

[illegible] বাঁচতে [illegible] না লুসি টার্নার। ডাক্তার হেনরী টার্নারের [illegible] মেয়ে লুসি। চার বছর বয়েসে তার মা

অ্যানিলিয়া আগুনে পুড়ে মারা যায়। লুসির এখনো মনে পড়ে, সেটা ছিল এক্সমাস ঈভের রাত।

তাদের সাজানো বাগান বাড়ীটাতে জ্বলছিল অনেকগুলো প্রদীপ। বিরাট সান্টা ক্লজটা তাকিয়ে ছিল তারা ভরা আকাশের দিকে। ক্যারল গান গাইবার জন্যে পিয়ানোর সামনে বসেছিল লুসি।

ডিসেম্বরের হিমেল হাওয়া তার হাড় কাঁপিয়ে হু হু করে বয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ চেনা কণ্ঠস্বর আর্তনাদ করে ওঠে। লুসি ছুটে গেল। তারপর যে দৃশ্যটা চোখের সামনে দেখেছিল সেটা ভাবতে গেলে আজও তার মন ভয়ে শিউরে ওঠে।

সে দেখেছিল একটা বীভৎস পোড়া বিকৃত দেহ। তখনো মরে নি, অসহ্য যন্ত্রণাতে ছটফট করছে। লুসি জানে যে ওটা হল তার মায়ের দেহ। কিচেনে স্টোভ জ্বালতে গিয়ে পুড়ে মারা গেছে তার মা অ্যানিলিয়া।

বাবাকে ডাকতে গিয়ে খুঁজে পেল না লুসি। কোথায় গেল তার বাবা? এই তো, একটু আগে, বাবার সঙ্গে কথা বলেছিল লুসি। চার বছরের বাচ্চা মেয়ে লুসি সেই অভিশপ্ত রাতটি একা কাটায় তার মৃতা মাকে আগলে রেখে।

তার চোখ মুখ চেনা যায় না। অথচ লুসি জানে যে তার মাকে রূপসী বলা যেতে পারে। কিন্তু কেন পুড়ে মারা গেল তার মা?

লুসি গত দশ বছরে নিজের কাছে এই প্রশ্ন তুলেছে বার বার। কোন জবাব পায় নি। কখনো তার মনে হয়েছে যে পৃথিবীর ওপর অবুঝ অভিমানে তার মা আত্মহত্যা করেছে। কেননা মা'র বিবাহিত জীবন সুখের ছিল না। অ্যানিলিয়া ছিল সৌখীন স্বভাবের মেয়ে।

আর হেনরী? বদমেজাজী রহস্যময় মানুষ। পার্থিব পৃথিবীর ঘটনাবলী তাকে আকৃষ্ট করতো না, সে আত্ম

জগতের তন্দ্রাচ্ছন্নতার মধ্যে। আত্মার স্বরূপ নির্ধারণে মগ্ন থাকতো খামখেয়ালী যুবক হেনরী।

তাই অসামান্যা সুন্দরী অ্যানিলিয়ার নিঃসঙ্গ দিনগুলো কাটতো একা। লুসি ছিল মায়ের বেদনার্ত মুহূর্তের নীরব সঙ্গী। সে চেয়ে চেয়ে দেখতো যুবতী অ্যানিলিয়ার দিন যাপন। নিশীথ রাত্রে হেনরী ব্যস্ত থাকতো মড়ার খুলির মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করার কাজে।

আর অ্যানিলিয়া সারা রাত জানলার গরাদে মাথা রেখে তাকিয়ে থাকতো চাঁদের দিকে, মধ্য রাতে উইলো পাতার খসখসানির মধ্যে উড়তো নিশিজাগা পাখি; লুসি অবাক চোখে দেখতো তার মায়ের দুটি আঁখিতে টলটল করছে অশ্রু।

ঠিক তখন পাশের ঘর থেকে ভৌতিক আর্তনাদে ভেসে আসতো ল্যাটিন ভাষাতে মন্ত্র উচ্চারণ; হেনরী টার্নারের বিকৃত কণ্ঠস্বরকে চাপা দিয়ে বেজে উঠতো আর একটি মোহিনী নারী কণ্ঠের নিনাদ—

When shall we three meet again
In thunder, lightning on in rain?

লুসি জানে যে ঐ কণ্ঠস্বর তার আন্টি ক্লারার, বাবা হেনরীর সঙ্গে সে-ও প্রেত-তৃষাতে মেতে উঠেছে।

ক্লারা, যৌবনের সঙ্গে রোমান্সের সমাবেশে যেন এক কুহকিনী মায়া-কন্যা। তার টানা টানা চোখের সবুজ মনিতে শুধুই হাত ইসারা করে মৃতার্ত কবরের শীতল স্নিগ্ধতা, তার কুটিল চিবুকে হত্যার নিপুণ কারুকাজ, তার রক্তাক্ত ওষ্ঠাধরে বিকৃত আত্মার বিষ-চুম্বন।

তেইশ বছরের যুবতী ক্লারা হয়েছে হেনরীর প্রেত-সাধনার সহকারিনী। রাতের পর রাত তারা নির্জন প্রকোষ্ঠে মগ্ন থাকে অলৌকিক অন্বেষণে।

সেদিন সারারাত ঝুরু ঝুরু তুষারের মধ্যে নিও অরিলনসের সেই বাংলো বাড়ীতে বীভৎস দগ্ধ মায়ের লাশ পাহারা দিতে দিতে চার বছরের মেয়ে লুসি ভেবেছিল অনেক কথা।

তারপর ভোর হল, ফিরে এল তার বাবা, এল ক্লারা। অ্যানিলিয়ার মৃতদেহ দেখে লোভে চক চক করে উঠেছে বাবার ছুটো চোখ। ক্লারার ঠোঁটে ফুটেছে কুটিল হাসি।

ছোট্ট লুসির মনে হয়েছিল তার মা'কে ওরা ষড়যন্ত্র করে হত্যা করেছে। হ্যাঁ, বাবা হেনরী খুনী, ক্লারার ছু হাতে মৃত মায়ের রক্ত যেন দেখতে পেল লুসি।

তারপর? একটি একটি করে কেটে গেছে তার অভিশপ্ত জীবনের দশটি বছর। প্রতিটি দিন বহন করেছে বেঁচে থাকার ছুঃখ। কেননা বাবা হেনরী তাকে করে তুলছে প্ল্যানচেটের মিডিয়াম।

প্রথম প্রথম ভীষণ ভয় করতো লুসির, যখন তার হাতে ধরা পেনসিলটা নড়ে উঠতো। যে সব মানুষগুলো অনেক বছর আগে মরে গেছে, যারা মরেছে কোন ছুর্ঘটনায় তারা কথা বলে উঠতো তার আঙুলে।

ভীষণ তেষ্টা পেত লুসির। অন্যের আত্মা যখন তার শীর্ণ দেহ খাঁচা ছেড়ে চলে যেত মহাকালের আকাশে, লুসির সমস্ত শরীর কি এক অনুভূতিতে থর থর করে কেঁপে কেঁপে উঠতো।

জন্ম-জন্মান্তরের সঞ্চিত পিপাসা যেন গ্রাস করত তার জিভ, চোখ ছুটি ঠিকরে বেরিয়ে আসবে, হাত বেঁকে যাচ্ছে, মাথায় ভীষণ যন্ত্রণা। কোষে-কোষান্তরে সংবাহিত অনন্ত বেদনা।

এক একটা ঘটনার পরে লুসি ভাবতো আর বাঁচবে না। তবু সে বেঁচে রইল, সেদিনের চার বছরের ছোট্ট মেয়ে লুসি আজ চোদ্দ বছরের কিশোরী।

প্রাকৃতিক নিয়মে তার দেহে যৌবন এঁকেছে পদচিহ্ন। কিন্তু লুসি সে ডাকে সারা দিতে পারে নি। এই রোমাঞ্চিত বয়েসে সে ভালোবাসে না বসন্ত-বাতাস, তার কানে ঢেউ তোলে স্তব্ধ রাতের মৌনতা। প্রেম তার কাছে অজানা, সে দেখেছে কবরের প্রশান্তি। প্রস্ফুটিত গোলাপের চেয়ে মৃত মানুষের হাড় সে বেশী ভালোবাসে।

আঁকড়ে ধরে কালো বেড়াল, অন্ধকারে ঘুমোতে চায়। পৌঁছে যেতে চায় মাটির নীচে, সেই অতলে, যেখানে সঞ্চিত আছে তার গত জন্মের দেনা।

সেই স্যাঁৎ স্যাঁতে শীতল প্রাণহীন চোরা কুঠরী যেন লুসির তৃষিত আত্মাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। বলছে—এসো, এসো, দেখে যাও। এখানে তোমার পিপাসার শেষ, তোমার আত্মার মুক্তি। পৃথিবীতে যে জীবন সেটা হল অনন্ত অসীম আত্মার যন্ত্রণা।

—এসো লুসি, আমরা পাতাল ঘরে ঢুকবো।

ক্লারা আগে চলে। লুসি চলেছে একটির পর একটি সিঁড়ি পার হয়ে পাতাল ঘরের মধ্যে। লোহার তৈরী দেয়াল, নিঃশ্বাস নেবার মতো যথেষ্ট বাতাস নেই, নেই সূর্যের আলো প্রবেশের ছিদ্র।

আলো বাতাসহীন এই কারাগারের তাপমাত্রা শীতল করা হয়েছে। যাতে মানসিকতার ওপরে আচ্ছন্নতার প্রলেপ আনা যায়।

লুসি দেখতে পেল তার বাবাকে। ঘরের এককোনে নিস্তব্ধ তার দেহ। সামনে শায়িত একটি প্রায় নিশ্চিহ্ন কঙ্কাল।

লুসিকে লোহার চেয়ারে বসাল ক্লারা। তার হাত বেঁধে দেওয়া হল, মাথার সঙ্গে লাগান হল ইলেকট্রিক তার। এবারে শুরু হবে ডাক্তার হেনরীর বিশেষ পরীক্ষা। লুসির অবচেতন মনে আলোড়ন তুলে তার আত্মাকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে গত জন্মে।

স্থির হয়ে বসে আছে লুসি। ঘরে জ্বলে ওঠে মৃদু নীলাভ আলো। বিদ্যুৎ তরঙ্গ পাঠানো হল তার মাথার কোষে। কেমন একটা ঘুম ঘুম অনুভূতির মধ্যে লুসির মনে হল সে যেন চোদ্দ বছরের মেয়ে নয়, নয় এক শীর্ণা কিশোরী, সে হল আগাথা, মিডলসেক্স রাজ-পরিবারের গর্বিতা বধূ আগাথা ব্যানিস্টার।

শায়িত কঙ্কালটা যেন উঠে দাঁড়িয়েছে। এগিয়ে আসছে লুসির

দিকে। দুটি কোটরাগত চোখে দপ দপ করে জ্বলছে কি বীভৎস লাল আলো, বুঝি শত শতাব্দীর ক্ষুধা তার!

ভয়ে চোখ বন্ধ করল লুসি। বাবা হেনরীর গলা শুনতে পেল। অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে তার গলা।

—মনে করো লুসি, তোমার গত জন্মের কথা। মনে করো লুসি, তুমি ছিলে না আমার মেয়ে, ছিলে অন্য দেশে, বলো, কি বলবে তুমি? বলো, তোমার ফেলে আসা জন্মের কথা।

লুসির মনে পড়ে। কতদিন সারা রাত ধরে বাবা তাকে জন্মান্তর-বাদের কথা বলতো। বাবা বলতো—আমাদের চেতনার স্তরের অন্তরালে আছে অবচেতনার জগত। সেখানে সব কেমন ছায়াময়, আধো অন্ধকারে দৃশ্যমান বস্তুর মতো। সেই প্যারা-সাইকোলজিক মনে এসে ভীড় করে ফেলে আসা জীবনের স্মৃতি। লুসি, কিছুই হারায় না। কিছুই শেষ হয় না। আত্মার মৃত্যু নেই। জন্মের পর জন্ম ধরে সে চলতে থাকে ইপ্সিত লক্ষের দিকে।

লুসির মনে পড়ে, আগাথাকে।

শরতের এক সোনালী সকাল। মিডলসেক্স রাজবাড়ীতে অনেক সুখী মানুষের ভীড়। আজ রাজবধূ আগাথার প্রথম বিবাহ বার্ষিকী। যুবরাজ পলকে দেখতে পেল আগাথা। সুপুরুষ, সুবেশী, সুমিষ্ট স্বরের অধিকারী।

কিন্তু তার ছবিটা ভেসে উঠতেই জঘন্য অনুভূতিতে ভরে গেল আগাথার মন। বিয়ের প্রথম রাত থেকে সে স্বামীকে সহ্য করতে পারছে না। তার মনে হয় পল যেন অত্যাচারী, তার অনিচ্ছাতে তার দেহে অধিকার স্থাপন করার চেষ্টা করছে।

বিয়ের পরে প্রথম রাত থেকেই পলের ওপর বুক-ভরা বিদ্বেষ জমে আছে আগাথার। মাঝে মাঝে সে ভাবে যদি......

যদি সে মুক্তি পেতো ব্যানিস্টার রাজবংশের হাঁপিয়ে উঠা প্রাসাদ থেকে। আগাথা স্বেচ্ছাবন্দী জীবন পছন্দ করে না। তাকে

ডাক দেয় অসংযমী সহবাস, রাতের পর রাত কেটে যাবে নতুন পুরুষের উষ্ণ আলিঙ্গনে।

নিজের অপরিসীম তৃষ্ণা মেটাতে সে বেছে নেবে সবল সুন্দর পুরুষদের। বিশেষ করে তার চেয়ে কমবয়সী কিশোরদের প্রতি আলাদা আসক্তি অনুভব করে আগাথা। মনে হয় ওরা যেন টগবগে উষ্ণ রক্তের প্রতীক, ওরা পলের মতো শান্ত নয়। এক লহমাতে তাকে নগ্ন করে নিঃশেষে পান করবে শারীরিক সুধা।

যেমন ভাবে কোচোয়ান জোসেফ তাকে তৃপ্তি দিয়েছিল।

ইস্টারের ছুটি কাটাতে ওরা গিয়েছিল গ্রাম্য প্রাসাদ ক্লেডসে। কিন্তু সেই নির্জন বাংলোতে এক রাতে একলা থাকতে হয়েছিল আগাথাকে! বিশেষ কাজে পল এসেছিল মিডলসেক্সে।

একা ? না, সঙ্গে ছিল ঝি আর ঐ কোচোয়ান।

সে রাতে আগাথা পড়েছিল দুধ-সাদা নাইটি। স্বচ্ছ আবরণ ভেদ করে তার কামাতুর দেহটা প্রস্ফুটিত হয়েছিল। নিশীথ সমাবেশে মনে জেগেছিল সুতীব্র আসঙ্গ লিপ্সা।

সে যখন বেডরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করতে যাবে তখন হঠাৎ জোসেফকে দেখতে পেল। ছেলেটা তাদের গাড়ী চালায়, সতেজ চেহারা, মুখের মধ্যে রুক্ষ কাঠিন্যের ছাপ। আগাথা বুঝতে পেরেছিল যে ছেলেটি তার পিপাসার্ত বাসনা মেটাবে।

তারপর বিশাল খাটে মৃদু আলোড়ন তুলে রাজবধূ আগাথা জড়ানো গলাতে বলেছিল—জোসেফ,' তুমি আমাকে শান্ত করো।

আর জোসেফ ? বন্য বর্বর জাতির সবল পুরুষ। সে দেখেছে নারী সম্ভোগের সহজতম উপায়। সে জানে শরীর সর্বস্ব মেয়েদের কাছে ছলনার কোন মূল্য নেই। তারা যেন কামনার আগ্নেয়গিরি।

মুহূর্তের মধ্যে জোসেফ নাইটির ফাঁসটা সজোরে খুলে নিরাবরণা করল আগাথাকে। আইভরি-রঙের তনুবাহার, নিখাদ অঙ্গের

সমাবেশ। আভিজাত্যের সুরভিত কোমল ত্বকে এলোমেলো হাত রেখে সে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিল অহংকারী আগাথাকে।

ঐ রাত যেন পরম কাঙ্ক্ষিত হয়ে নেমেছিল আগাথার জীবনে।

আজ তার বিয়ের প্রথম বছরে আগাথার বার বার মনে পড়েছে ঐ রাতের কথা।

সে রাত তাকে গরবিনী করেছিল। তারপর কতবার সে শরীরের চাবি তুলে দিয়েছে দস্যু জোসেফকে।

পলের কাছ থেকে ক্রমেই সরে গেছে সে।

সোনালী সকালটা ফুরিয়ে গিয়ে নেমে এল রাত। উৎসব শেষে বেডরুমে প্রবেশ করল আগাথা। পল তার প্রতীক্ষাতে বসে আছে সিগার ঠোঁটে। কিন্তু আগাথার দাউ দাউ বহ্নিকে সে কি সীমিত ক্ষমতায় মেটাতে পারবে ?

আগাথা জানে এই প্রাসাদে সারাটি জীবন তার কাটবে এক-দেহ ক্ষুধা নিয়ে। সে মুহূর্তে জ্বলে ওঠে, গোবলেটে রক্ত রঙা মদিরা। হাসল আগাথা। তার দুটি ভরাট স্তনের মাঝে ঝুলছে লকেট, যেটাতে রয়েছে বিষের গুঁড়ো। আজ সকাল থেকেই এই মুহূর্তটির প্রতীক্ষা করছিল আগাথা।

বিষের রঙ নেই, রক্ত-তরল টলটল করেছে। হাসতে হাসতে গোবলেট তুলে দিল পলের ঠোঁটে, ফিস ফিস করে বলল—আজকের স্মরণীয় রাতটাকে মনে রেখো—

হায়! বেচারী, তুমি কি জানো যে কোনদিন ভোর দেখা হবে না তোমার ?

মাঝ রাতে আর্তস্বরে চীৎকার করে আগাথা। পল নাকি মারা গেছে। রাজপ্রাসাদে আলোড়ন পড়ে গেল। নেমে এল শোকের ছায়া।

কালো গাউন পরে আগাথা সাজল বিধবার বেশে। শুচীতার আড়ালে শুরু হল তার দেহ বিকিকিনি।

রাতের পর রাত কত পুরুষের কাছে আত্মনিবেদন করে তৃপ্তা হয়েছে আগাথা। জোসেফ, হলডেন, উইলিয়াম, ফ্রানসিস—কতো নাম। আগাথা সবাইকে সঙ্গী করেছে।

মাথার মধ্যে আরোপিত চেতনারা ধীরে ধীরে বিদায় নিচ্ছে। অনেক গভীর ঘুমের কালরাত্রির অবসানে লুসি যেন চোখ মেলবে।

কিন্তু অর্ধ- উন্মোচিত চেতনার মধ্যে কে যেন আধিভৌতিক স্বরে বলছে—লুসি, তোমার আত্মায় গত জন্মের মলিনতা। তুমি নিজের স্বামীকে বিষ দিয়ে হত্যা করেছিলে। তুমি নিজের স্বামীকে বিষ দিয়ে হত্যা করেছিলে। তুমি ঘাতিকা, তুমি কলঙ্কিতা।

মুখে হাত চাপা দিয়ে চোদ্দ বছরের নিষ্পাপ মেয়ে লুসি চীৎকার করে বলতে চায়—ওটা ছিল আমার দুঃস্বপ্ন, আমার বিগত জীবনের পাপ। এ জীবনে আমি পবিত্র হতে চাই।

রুদ্ধ ঘরের শূন্য বাতাসে প্লাবন তুলে ভৌতিক স্বর বাজতে থাকে—তুমি হত্যাকারী। তুমি ঘাতিকা। তুমি কলঙ্কিতা।

লুসির ঘুম ভাঙে। কত বছর সে নিদ্রামগ্ন ছিল এই অপার্থিব পাতাল ঘরে।

মাথাটা ঝিমঝিম করছে। রক্ত চলাচল থেমে গেছে। গোটা শরীরকে ছেয়েছে শূন্যতা। লুসি তাকিয়ে আছে, তার দৃষ্টিতে ভাষা নেই।

ধীরে ধীরে বোধশক্তি ফিরতে থাকে। লুসির বিবর্ণ চোখ রঙীন হয়ে ওঠে। কিন্তু তার স্মৃতির মধ্যে বাজছে আগাথার কণ্ঠস্বর।

—শোন, লুসির জন্ম চেতনার মধ্যে আবার বেজে ওঠে ক্লারার গলা, মনে কর লুসি, আগের জীবনে তুমি ছিলে মিডিলসেক্স রাজ-পরিবারের এক কলঙ্কিতা রমণী। প্রথম বিবাহ বার্ষিকীর রাত্রে তোমার দেওয়া বিষ পান করে মারা গিয়েছিল তোমার স্বামী পল। তুমি হত্যাকারী। তোমার দেহের প্রতি কোষে সঞ্চারিত হচ্ছে সেই

রক্ত পিপাসা। এ হল তোমার জন্মান্তরের দেনা, এ জীবনে তোমাকে আবার হত্যা করতে হবে।

—না, না, মুখে হাত চাপা দিয়ে ভীষণ জোরে চীৎকার করে ওঠে লুসি।

তার দেহটা গড়িয়ে পড়ে মাটিতে। তখন তার বুকের মধ্যে বেজে চলেছে নারী পিশাচ ক্লারার ডাকিনী কণ্ঠের আর্ত্তনাদ।

লুসির মনের মধ্যে সেই কালো বেড়ালটা ঘুরতে থাকে, তার মনে পড়ে যায় বীভৎস রাতে পুড়ে যাওয়া অ্যানিলিয়ার বিকৃত লাসের কথা।

মনে মনে সে প্রশ্ন করে—সত্যি আমি কি গত জন্মে ছিলাম স্বামী ঘাতিনী এবং কলঙ্কিতা রমণী আগাথা?

বদ্ধ ঘরের শূন্য বাতাসে মৃদু স্পন্দন তুলে আলোড়িত হতেথাকে সেই বিবর্ণ মহাকালের কণ্ঠস্বর। মৌনা হয়ে লুসি শুনতে থাকে।

—শোন লুসি,

এ কার কণ্ঠ? চোদ্দ বছরের জীবনে লুসি তো কোনদিন এমন অপার্থিব ভয়ঙ্কর কণ্ঠস্বর শোনেনি। তবে এই কি সেই হাজার বছরের শীতল কবরের শ্যাওলা জমা স্যাঁতসেঁতে কোণে মৃত্যুর গহন বিভীষিকার মধ্যে জন্ম নেওয়া রক্ত পিয়াসী ভ্যাম্পায়ারের কণ্ঠস্বর?

যে ভ্যাম্পায়ার জীবিত-রক্তপানে নিবৃত্ত করে তার তৃষ্ণা?

লুসি আবার হারিয়ে যায় অবচেতনার অন্ধকারে। তার সমস্ত সত্বা ঘিরে বজ্রপাতের মত, যুদ্ধক্ষেত্রে মর্টারের মত অথবা আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের মত শুধু ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে থাকে অশরীরী রক্ত চোষকের অপার্থিব শব্দাবলী।

—শোন লুসি, শুধু গত জন্মে নয়; তার আগের জন্মে তুমি ছিলে মধ্য ইরাকের গাজা নগরীর এক রঙ্গিনী বারবনিতা, তুমি নিজে হাতে তুলে দিয়েছ বিষ ভরা সরাবের গোল পাত্র। শুধু কি তাই? অপঘাতে মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত তোমার জঘন্য চক্রান্তে সুখী

মানুষের জীবনে নেমে এসেছে দুঃস্বপ্নের কালোরাত্রি। সেই জন্মে তোমার নাম ছিল সেইবা।

মনে পড়ে যায়, লুসি যেন হারিয়ে গেছে মধ্য ইরাকের উত্তপ্ত বালুকা ভরা বিশীর্ণ নগরী হাজাতে। সেখানে এক প্রকোষ্ঠে অন্ধকারের মধ্যে জঞ্জালের আবরণ সরিয়ে বাস করে নগরের অন্যতমা রূপবতী সেইবা। যাকে ঘিরে বাতাসে ওঠে ষড়যন্ত্রের ফিসফাস, যার নিঃশ্বাসে সারা রাত শকুনের চিৎকার। সেই সেইবাই আজকের চোদ্দ বছরের অপাপবিদ্ধা কিশোরী কন্যা লুসি।

—মনে কর লুসি, তারও আগের জন্মের কথা…।

এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে লুসির যেন মনে হল প্রজ্বলিত শিখার মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে। স্বৈরিণী রমণীর এলোকেশের মত ধেয়ে আসছে বহ্নিশিখা। আর এক মুহূর্ত মাত্র। তারপরে লোল জিহ্বা দিয়ে ঐ আগুন গ্রাস করবে তার কোমল তনু বাহার। কবরে সমবেত হাজার হাজার উল্লসিত মানুষের কণ্ঠে নিনাদিত—ডাইনী মেরিয়ার মৃত্যু হোক।

ডাইনী? চল্লিশ বছরের অনন্যা রূপসী পেয়ে মেরিয়া সত্যিই কি ডাইনী? তা না হলে খোদ লণ্ডন শহরের বুকে কেমন করে ঘটে ঐ সব অলৌকিক ঘটনাবলী। কেন কবর থেকে হারিয়ে যায় মিস ড্যাণ্ডলের্ডের মৃতদেহ? কেনই বা পিকাডেলি সার্কাসের জনবহুল রাস্তা থেকে হঠাৎ অন্তর্হিত হয়ে যান শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তি মিষ্টার প্রিয়াবলি? কেন রূপসী মেরিয়ার চোয়ালের দুটি দাঁত ঠোঁট থেকে দু ইঞ্চি বেরিয়ে থাকে, বুঝি রক্ত পানে কাতর হয়। এ সবই হল অভিশপ্ত ডাকিনী বিদ্যার ফল।

আর কিন্তু ভাববার অবকাশ পায় না মেরিয়া। আগুন তার পায়ের পাতা স্পর্শ করেছে। তারপরে মুহূর্তের মধ্যে গোটা শরীরকে লেহন করেছে লোলুপ দৃষ্টিতে। আকণ্ঠ পিপাসা পায় তার, গলা শুকিয়ে ওঠে এবং……

—একটু জল খাব, মৃদু কণ্ঠে তন্দ্রাচ্ছন্নতার মধ্যে লুসি বলে।

ক্লারা হেনরীর চোখের দিকে তাকায়। তারপর ঠোঁট নাবিয়ে বলে—আজকের মতো এখানেই শেষ।

হেনরী জবাব না দিয়ে পাতাল ঘরের দরজা খুলে ওপরে চলে যায়। ক্লারা অনেকক্ষণ মেঝেতে শায়িতা লুসির বিবর্ণ চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকে। জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটে আর ভাবে বীভৎস কোন এক মুহূর্তের কথা। যখন শীর্ণা ঐ মেয়েটিকে সে সম্পূর্ণভাবে গ্রাস করবে।

এক বুক পিপাসা নিয়ে ওখানে পড়ে থাকে লুসি। ক্লারা ওপরে চলে যায়।

এই সেই ইতিহাসের অনেক রক্তাক্ত ঘটনার নীরব সাক্ষী। সর্বনাশা নীলনদের তীরে ঘটে গেছে অকারণ হত্যা। কুহকিনী রমণী দেহের দুর্বার আকর্ষণে বারবার উদ্বেল হয়েছে পুরুষ হৃদয়। এই সেই নীল ধুসর পটভুমি, সেখানে মৃত্যু যেন দরদী শিল্পীর মত বিকীর্ণ আখরে লিখেছে হত্যা-লালসা-ব্যভিচার আর ষড়যন্ত্রের কাহিনী। এখানে শায়িত আছে অসংখ্য মমি যারা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মহাকালের বিলীয়মান মৃত আত্মার ধারাবাহিক ক্রন্দন শ্রবণ করে।

এখানে আছে বিরাট আকারের স্প্রিংস, যার অতল গহ্বরে সজ্জিত আছে তিল তিল করে জমান রত্নরাজি। এই উপত্যকায় একা এসেছিলেন রাজা চতুর্দশ টলেমির বোন ক্লিওপেট্রা। হাজার বছর পরেও যে পৃথিবীর নগর বধুদের মনে ঈর্ষা জাগিয়ে তোলে এবং যে কোন পুরুষকে করে শরীর কাতর। একুশ বছরের যুবতী শিখরি দশনা তন্বী পীনোন্নতা মীনাক্ষী ক্লিওপেট্রাকে দেখে যেন ঝড় উঠেছিল রোমান সম্রাট সীজারের মনে।

তারপর আত্ম গরিমায় দুর্বার সম্রাট জুলিয়াস সীজারের বাসনার

মোমে গড়া পুতুল হয়ে রূপসী শ্রেষ্ঠা ক্লিওপেট্রা মদমত্ত পদক্ষেপে প্রবেশ করলো রোম শহরে। ভেবেছিল সে, সীজারের অঙ্কশায়িনী হয়ে সুখ সৌন্দর্য আর বৈভবের অনন্ত সমুদ্রে ডুব দিতে দিতে পরিণত হবে সোনার প্রতিমায়।

কিন্তু অন্তরালে বুঝি কুটিল হাসি হেসেছিল সেই তিন ডাকিনী, যাদের দেখা মেলে অন্ধকারে-ভুমিকম্পে-ঝঞ্ঝায়। তাই বুঝি ব্রটাসের হাতে নৃশংসভাবে মারা গেল অহংকারী সীজার। বিধ্বস্ত রোম শহরকে পেছনে ফেলে রেখে শরীরের পিপাসা নিয়ে কুহকিনী ক্লিওপেট্রা এলো আলেকজান্দ্রিয়াতে।

এখানে যেন তারই অপেক্ষাতে দিন কাটাচ্ছিল জুলিয়াসের বন্ধু অ্যান্টনি। তারপর? যখন রোমের সিংহাসন দখলের লড়াইতে অবতীর্ণ হয়েছে অগাষ্টাস আর লেসিডাস তখন নীলনদে ছুটে চলেছে অ্যান্টনীর প্রমোদ তরনী। শরীরের সাথে শরীর মিশিয়ে যখন তখন বেজে উঠছে এক অপূর্ব সিমফনী।

কিন্তু ঘুমন্ত মমি, স্প্রিংস আর পিরামিডের রহস্য আবৃত দেশ হল মিশর, যেখানে ঝড় ওঠে মরুভূমিতে, সেখানে সুখ কখনো দীর্ঘস্থায়ী হয় না। তাই অগষ্টাসের হাতে পরাজিত হল অ্যান্টনী। যে শরীর নিয়ে ক্লিওপেট্রার গৌরবের অন্ত ছিল না, অবশেষে সেই দুর্বার যৌবনকেও আত্মাহুতি নিতে হল ভাগ্যের হাতে। হারিয়ে গেল রঙ্গিনী রমণীদের অন্যতমা ক্লিওপেট্রা।

নিজের হাতে ধরা বিষাক্ত সাপিনীর মুহুর্মুহু দংশনে ক্রমে দেহটা নীল হয়ে গেল তার। যে নদের বুকে একদা চলেছিল তার কামলীলা আজ সেখানে শায়িত হল হতভাগিনী ক্লিওপেট্রার বিষ জর্জর মৃত দেহ।

শুধু কি ক্লিওপেট্রা? মিশরের ইতিহাসে ছড়ানো আছে এমন অনেক ক্লিওপেট্রার কাহিনী। যেমন আছে বিপ্লবী ফ্যারাও আখোনাটনের রূপসী স্ত্রী নেফারতিতি, আছে সমগ্র ঐশ্বর্যের একচ্ছত্র

সম্রাজ্ঞী রাসী সেবা, আছে পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম নির্বাসিতা প্রেমিকা আমেন। তাই বুঝি মিশরের বাতাসে মধ্য দিনে মধ্যরাতে ভেসে বেড়ায় রহস্য তন্ময়তা।

চোখ খুলে লুসি দেখল ঘরে জ্বলছে সেই স্বপ্নময় নীল আলো। সে তাকাল, চোখের সামনে ছায়ার মত সরে যায় দুটি দৃশ্য, একটিতে যে উদ্দাম অভিসারে মত্ত, হাতে তার সুরা পাত্র, সুরমা টানা চোখের কোনে যৌবনের সহস্র সঙ্গীকরে। অন্য ছবিটি এক দেহ পিপাসু বুভুক্ষু রমণীর, যে প্রতিরাতে নিজেকে নিবেদিত করে এক কিশোরের কাছে।

—না, না, বিশ্বাস কর, এ জীবনে আমি সেইবা অথবা আগাথা হতে চাই না। আমি পবিত্র ভাবে বাঁচতে চাই। দেখতে চাই বসন্তকে। উপভোগ করতে চাই দূর আকাশ দিয়ে উড়ে যাওয়া স্কাইলার্কের কাকলি।

আত্মার গভীরে প্রোথিত চেতনার মধ্যে আলোড়িত এক বাঙ্ময় সত্বা লুসিকে বার বার মনে করায়, সে ব্যাভিচারিনী সে কলঙ্কিতা এবং সে হত্যাকারী।

দুটি পরস্পর বিরোধী চিন্তার মধ্যে পিষ্ট হতে হতে লুসি যেন ক্রমশঃ ডুবতে থাকে—চেতনা থেকে অবচেতনাতে, আলো থেকে অন্ধকারে, জীবনের উল্লাস থেকে মৃত্যুর নীরবতায়।

হাতখানি কেঁপে ওঠে তার। পাথরের স্লেটে আঁকা বাঁকা এলোমেলো অক্ষরে কি যেন লিখছে সে। সে, লুসি, এই কদিনে আরো একটু শীর্ণা হয়েছে। সেদিন ছিল রহস্যময় মিশরে, আজ এসেছে আমেরিকাতে। এখন নিউইয়র্ক শহরের এক আকাশ ছোঁয়া বাড়ীর সতেরো তলার একটি নিভৃত ঘরে বসেছে হেনরীর ডাকিনী বিদ্যার পরীক্ষা। এখানে লুসিকে করা হয়েছে মিডিয়াম, যার মাধ্যমে অশরীরী আত্মারা ক্ষণকালের জন্য জীবন্ত হয়ে উঠবে।

—কি দেখতে পাচ্ছো লুসি ?

উদ্বিগ্ন কণ্ঠে ক্লারা প্রশ্ন করে। কোন জবাব নেই। সে লুসির মাথার মধ্যে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ পাঠায়, ঘরের তাপমাত্রা আরো একটু কমিয়ে দেয়, তারপর তার এক আঙুল লুসির কপালে রেখে সম্মোহনের নিপুণ ভঙ্গিতে দাঁতে দাঁত চেপে চোখ স্থির রেখে আবার প্রশ্ন করে—জবাব দাও, তোমার চোখের সামনে কার মুখ ভেসে উঠেছে ?

বিদ্যুৎ তরঙ্গে লুসির চেতনা অব্যক্ত যন্ত্রনায় একবার মাত্র কেঁপে ওঠে, তারপর সে আচ্ছন্নের মত বলে—আমার চোখের সামনে আবছা কুয়াশার মধ্যে ভেসে ওঠে একটি শিশুর মুখ। সে হলো তিন বছরের আদরের মেয়ে. সে থাকে পার্ক এ্যাভিনিউর ৫৬ নং বাড়ির দোতলায়। তার বাবা মিঃ জনকিল বার্ণ হল অটোমোবাইল কোমপানির ম্যানেজার।

···মেয়েটিকে এখন তার মা কোলে করে নিয়ে চলেছে কেজে। এই মুহুর্তে তারা রাস্তা পার হবে।

—শোন লুসি, তোমার সমস্ত চেতনা কেন্দ্রীভূত কর ঐ তিন

বছরের মেয়েটির ওপরে। আর অন্তরের সমস্ত অভিশাপ সংবাহিত করো তার প্রতি। যেন রাস্তা পার হতে গিয়ে দ্রুত বেগে ছুটে আসা মোটরের তলায় প্রাণ হারায় সে।

—না, আমি এই হত্যা কিছুতেই করতে পারবো না।

মুখ বন্ধ, তাই লুসির কণ্ঠস্বর শোনা গেল না। কিন্তু তার চেতনার মধ্যে ঐ শব্দ কটি আলোড়িত হবার সঙ্গে সঙ্গে ক্লারার হাতের ইলেকট্রিক চাবুক নিঃশব্দে একবার ঝলসে ওঠে। গুমরে কাঁদে লুসি, এ কান্না অশ্রু বিহীন, শুধু তার অন্তর-আত্মা কেঁপে ওঠে। সে তার চেতনাকে একত্রিত করে পার্ক এ্যাভিনিউতে।

যেন চোখের সামনে ছবির মতো দৃশ্যমান ঐ ফুটফুটে মেয়ে লুইজ্যা। তার মা তাকে এক পা এক পা করে হাঁটাচ্ছে রাস্তা দিয়ে।

লুসি মনে মনে চিন্তা করছে······একশো পঞ্চাশ মাইল বেগে ছুটে আসছে ক্রীম রঙের রেসিং কার। যেটি আর এক মুহূর্তের মধ্যে লুইজ্যাকে ভূপাতিত করে বেরিয়ে যাবে।

একটি মুহূর্ত, একটি শিশুর জীবন আর মৃত্যুর মাঝে দোদুল্যমান সুতোর মত আন্দোলিত। লুসির কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম, বাইরে প্রথম জানুয়ারীর হিমেল রাত।

হঠাৎ লুইজ্যার চিৎকার শোনা গেল। হলুদ ফ্রক পরা একরাশ সোনালী চুলের ফুটফুটে মেয়েটির কোমল বুক চিরে উষ্ণ রক্ত পান করেছে তৃষিত পার্ক এ্যাভিনিউ।

তার মা রাস্তার ওপর আঁকড়ে ধরেছে রক্তাক্ত লুইজ্যাকে। খুনী রেসিং কারে বিদ্যুৎবেগে ট্রাফিকের নিয়ম না মেনে ছুটে চলেছে দৃষ্টির অন্তরালে।

কিন্তু এ কি ? ক্লারার চোয়াল বেয়ে তাজা রক্তের স্রোত আসছে কেন ? এবং দৃশ্যমান তার দুটি হিংস্র শ্বদন্ত ? তবে কি সে অনাদি অনন্ত কালের ভ্যামপায়ার ?

ভয়ে-বিস্ময়ে-অনুশোচনায় লুসি জ্ঞান হারাল।

সেই প্রথম, সেই শুরু। তারপর? তারপর?

তারপর অনেকক্ষণ লুসি নিজের আত্মাকে প্রশ্ন করেছে দুরন্ত অনুশোচনায়। তারপর রাত গভীর হলে কে যেন তাকে লীলায়িত ভঙ্গিমায় ডাক দেয়।

লুসি আজ আচ্ছন্নের মত শুয়ে ছিল তার বিছানায়। জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে হিমেল হাওয়ার হাহাকার বিদীর্ণ হচ্ছে শহর নিউইয়র্কের অন্তরে।

নিজের ঘরের মধ্যে লুসি যেন ভয়ে অশরীরী অস্তিত্ব অনুভব করে।

এ এক অদ্ভুত অনুভূতি, যাকে সে চোখে দেখতে পাচ্ছে না অথচ প্রতি মুহূর্তে উপলব্ধি করছে তার নীরব পদচারণা। শুনছে তার বিকৃত কণ্ঠস্বর এবং স্পর্শ পাচ্ছে তার অপার্থিব দেহ বাহিত দুর্গন্ধ বাতাসের।

কে সেই অশরীরী?

লুসির একবার মনে হয় তারা হল পৃথিবীর সর্বত্র হাওয়ার মধ্যে শুষ্ক কণার মতো ঘুরে বেড়ানো অপঘাতে মৃত আত্মা। অথবা এমনও হতে পারে, যারা জীবনের অনেক স্বাদ অপূর্ণ রেখে মৃত্যুর ডাকে সাড়া দিয়েছে সেই সব পিপাসার্ত মানুষ।

ওদের যেকোন পরিচয় হোক না কেন, লুসি জানে ওরা বাস করে মধ্য রাতের হিম কুয়াশায়। চোখে দেখা না গেলেও প্রতি মুহূর্তে সে ওদের নীরব উপস্থিতি অনুভব করে তার দগ্ধ হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনে।

অথবা ওরা কি তার মা অ্যানিলিয়ায় মতো? যারা হারিয়ে যায় এই পৃথিবী থেকে, কোন জঘন্য মানুষের রক্তাক্ত ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে।

লুসি জানলার সামনে দাঁড়াল। আশে পাশে কেউ কোথাও জেগে নেই, শ্রুত হচ্ছে ঘুমন্ত মানুষের নিঃশ্বাসের শব্দ। যদিও জীবনের কোন অর্থ নেই তার কাছে।

কেননা আজ তার অশুভ চিন্তায় একটি তিন বছরের মেয়েকে পাড়ি জমাতে হয়েছে পরলোকে।

এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের জন্য মানুষের যাবতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষাকে উপহাস করে নিঃশব্দে জাগে লুসি।

লুইজ্যাকে মনে পড়ছে লুসির। চোখ বন্ধ করলে সে যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে তিন বছরের ঐ ফুটফুটে মেয়েটিকে। বড়ো হবার অপূর্ণ স্বপ্ন ছিল তার, ছিল পৃথিবীকে ভোগ করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা।

জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখল লুসি, তুষারের আচ্ছাদনের মধ্যে দূরে দেখা যাচ্ছে নিউইয়র্কের পামগ্রো এ্যাভিনিউর। সারাদিন যে রাস্তাটি অসংখ্য মানুষ আর যানবাহনের চলাচলে মুখরিত থাকে এখন সেখানে নেমে এসেছে অদ্ভুত নীরবতা। মনে হয় যেন কোন এক মোহিনী যাদুকরীর কঙ্কাল-দণ্ড ছোঁয়াতে দুরন্ত শিশু সারাদিনের খেলার শেষে ঘুমিয়ে পড়েছে।

এই ঘরে লুসি একা, অবশ্য ভয় শব্দটা তাকে কোনদিন গ্রাস করতে পারেনি। যে বয়েসে অন্য সব মেয়েরা বাবা-মার সস্নেহ আচ্ছাদনের মধ্যে থাকে সেই বয়েসে লুসি দিন কাটাচ্ছে একলা।

পাশের ঘরে একই শয্যায় শায়িত তার সাইক্রিয়াটিস্ট বাবা হেনরী আর ঐ মানবী ডাকিনী ক্লারা।

চোদ্দ বছরের মেয়ে লুসি এখন সব কিছু বুঝতে পারে। কেন ক্লারা তার দিকে তাকিয়ে থাকে এমন রক্ত লোলুপ দৃষ্টিতে, কেন বাবা হেনরী ইদানীং তার প্রতি ক্রমশঃ উদাসীন হয়ে উঠছে এবং কেনই বা ওরা দুজনে মিলে শারীরিক আর মানসিক অত্যাচার করে তাকে পরিণত করছে একটা চেতনা বিহীন জড় পদার্থে—এসব রহস্যের আবরণ এখন উন্মোচিত হয়ে গেছে লুসির কাছে।

যে বয়সে আকাশের রঙ থাকে আশ্চর্য নীল, ফুলেরা হয় রামধনুর সাতটি রঙের, ডাকতে ডাকতে উড়ে যাওয়া ক্যানারি পাখীটিকে মনে হয় নিকটতম বন্ধু, সেই বয়সে লুসির কাছে পৃথিবীর রঙ কালো।

ভালো লাগে তার মধ্য রাতে শকুনির কান্না, খাঁ খাঁ নিঃঝুম দুপুরে শিকারী নেকড়ের নিঃশ্বাস।

কিন্তু লুইজ্যা? সেই দলিত মথিত রক্তাক্ত বিকৃত শিশুটি যেন লুসিকে আকর্ষণ করছে।

লুসি ভাবতে ভাবতে চলেছে শহর নিউইয়র্কের এককোনে, ফিফথ এ্যাভিনিউ ছাড়িয়ে আকাশ ছোঁয়া ষ্টেট বিল্ডিংসকে পাশে রেখে শহরের সীমান্তে অবস্থিত কবরখানাতে। যেখানে শায়িত আছে অপঘাতে মৃত মানুষের দল, হত্যা অথবা আত্মহত্যা যাদের জীবন দীপ নিভিয়ে দিয়েছে। এবং প্রতিটি মৃত আত্মার অন্তরালে পুঞ্জীভূত আছে অপূর্ণ অভিলাষ, নীরব প্রতিশোধের স্পৃহা।

লুসি প্রবেশ করে, উঁচু পাঁচিল ঘেরা ঐ বিস্তৃর্ণ কবরক্ষেত্রে নেমে এসেছে হিমেল রাতের ধূসর মলিন ভাস্বরতা। সারি সারি মানুষের মৃতদেহ, শ্বেত পাথরে সঞ্চিত আছে অশ্রু জলে সিক্ত কাহিনী।

লুইজ্যা কোথায়? লুসি কি জানে শত সহস্র অশ্রুলিপির মধ্যে কোথায় আছে তার প্রথম শিকার লুইজ্যা?

কোথা থেকে যেন ভেসে আসে মৃদু ক্রন্দনের ধ্বনি। উড়ন্ত শকুনের অপলক চোখে ঠিকরে আসে লালসা। লুসি দেখতে পায়, ভয়ে দুটি চোখ বিস্ফারিত হয়ে যায়। সাদা পাথরের ওপরে লাল রক্তের দাগ, হয়তো বা উষ্ণ।

পাথরে রক্ত? থমকে দাঁড়িয়ে গেল লুসি, এ কেমন করে সম্ভব?

চোখ তুলে তাকালো সে, সারারাত ধরে তুষারের পাশাপাশি ঝরেছে রোজ মেরি ফুলের পাপড়ি। রৌদ্র নেই, তাই এখনও সতেজ। হয়তো বা সুগন্ধিত।

কান্নার শব্দটা বাড়তে থাকে, মনে হয় গোটা প্রকৃতি বুঝি তার প্রতিবাদ জানাচ্ছে। লুসির চোখে পড়ল সদ্য প্রোথিত কাঠের ফলকে লেখা আছে কয়েকটি শব্দ, যারা তার চেতনাকে আলোড়িত করতে পারে। লেখা আছে—

Here lies one whose name is
writen in water…

তলাতে লেখা—মিস লুইজ্যা বার্ন। জন্ম—সাতাশে জানুয়ারী, ১৯৭৪। মৃত্যু—দশই জানুয়ারী, ১৯৭৭।

একি? নিজের দুহাতে জমাট রক্ত দেখে প্রচণ্ড ভয়ে চীৎকার করতে যায় কিশোরী লুসি। পারে না, কে যেন তার মুখ স্তব্ধ করেছে। এখুনি এই কবরখানা থেকে না পালাতে পারলে কাল সকালে এখানে আবিষ্কৃত হবে মৃত্যুহীন একটি শীর্ণা কিশোরীর মৃতদেহ।

লুসি সেটা জানে। কিন্তু কোন অদৃশ্য মায়া তার গোটা দেহটাকে পাথরের ষ্ট্যাচুর মত দাঁড় করিয়ে রেখেছে কবরখানার তুষার পিছল মাটিতে।

এ কোন মায়া? যা মানুষকে পঙ্গু করে তোলে? এ কোন শক্তি? যা মানুষকে বোবা করে দেয়? এ কোন ছলনা? যা মানুষকে মধ্য রাতে হাতছানি দিয়ে ডেকে আনে সমাধি ক্ষেত্রের বিরাজিত নিস্তব্ধতার মধ্যে?

হয়তো বা শোনাতে চায়, বলতে চায় সেই চির অজানা কথা। দেখ লুসি, একদিন তোমাকেও এমনভাবে শুয়ে থাকতে হবে ধরিত্রী মাতার গহ্বরে। দিনে দিনে, শরতে, শীতে, বসন্তে তোমার দেহে ধরবে পচন, তুমি পরিণত হবে বীভৎস বিকৃত কঙ্কালে। তারপর কালের নিয়মে সেই হাড়ের কাঠামোতে একদিন ধরবে ভাঙন, অস্থি মজ্জা রক্ত বিহীন শুকনো কঙ্কালের বুকে ভীষণ দাঁত বসাবে মহাকাল।

তারপর ঝুর ঝুর করে ভেঙে গুঁড়িয়ে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে তোমার অহংকারের, ঘৃণার অথবা ভালবাসার এই শরীর।

লুসি অনেকক্ষণ নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। চেতনা ফিরতে তার মনে হল এখনও এখানে অনেক কাজ বাকি। লুইজ্যা তাকে ডাকছে।

কিন্তু তার আগে……।

……আমার দিকে চেয়ে দেখ লুসি। মাত্র সাত দিন আগে আমি ছিলাম এই শহরের শ্রেষ্ঠতমা সুন্দরী। আমার হাসিতে মুক্তো ঝরে পড়তো, লোকে বলতো আমি নাকি যৌবন নামক দুরন্ত পাখীটিকে বন্দী করেছি আমার দেহের সোনার খাঁচাতে।

লুসি তাকিয়ে দেখল, বিস্মিত হল। এই অন্ধকারে, নিঝুম রাতে, প্রচণ্ড শীতের মধ্যে, তুষারের ধারাবাহিক বর্ষণে তার বিস্ফারিত চোখের সামনে দাঁড়িয়ে আছে যে নারী মূর্তি, অলৌকিক জ্যোৎস্নায় স্নাতা, সে কি এই নগরের শ্রেষ্ঠা রূপসী ?

রূপ সম্পর্কে কোন উপলব্ধি নেই লুসির, আজ অবধি কোনদিন আয়নার সামনে ধরে নি স্ফুটনোন্মুখ দেহটি, দেখেনি কেমন করে প্রাকৃতিক নিয়মে সেদিনের শীর্ণা বালিকার দেহে যৌবনের প্রলেপ পড়েছে।

তবু সে স্বীকার করতে বাধ্য হলো যে তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ঐ রমণী সৌন্দর্যের এক প্রতিচ্ছবি ? কিন্তু এখানে কেন ? এই অন্ধকারে ? মৃত্যুর নীরবতায় ?

—আমার দিকে তাকাও, ভাল করে দেখে, দেখতে কি পাও রঞ্জিত চোখের নীচে জমে আছে শতাব্দী বাহিত কালিমা ? শুনতে কি পাও আমার উদ্ধত বুকের আড়ালে ধ্বনিত অপমানিত আত্মার ক্রন্দন ? তাই আমি স্বেচ্ছায় বিদায় নিয়েছি তোমাদের হিংসার পৃথিবী থেকে।

…এ পৃথিবী আমার ভাল লাগে না, যেখানে পুরুষের লোভী চোখ রূপের হাটে শরীরের ব্যবসা করে, যেখানে জন্মই হল নির্যাতন। তাই গত পরশু রাতে আমার একুশ তলা অ্যাপার্টমেণ্টের ব্যালকনি থেকে আমি লাফ দিয়েছিলাম শূন্যে। কেন জানো ? একটু শান্তির জন্যে। আমার তন্বী দেহটা জানুয়ারীর হিম বাতাসের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে আছড়ে পড়ল শহরের ইস্পাত কঠিন রাজপথে।

…লোকে বলত এমিলি নাকি রূপ চর্চার শেষ অধ্যায়। সেই এমিলি পরিণত হল এক তাল রক্তাক্ত মাংস পিণ্ডে। মর্গের ডাক্তার ডিসেকটিং টেবিলে আমার তালগোল পাকানো দেহটি নিয়ে খুব সমস্যায় পড়ে যায়। কেননা আমাকে তখন নাকি মানুষ বলে চেনা যাচ্ছিল না, মনে হচ্ছিল এক বিদঘুটে প্রাণী।

…ওরা বৃথাই আমাকে সিজার্স আর ফরসেপের আক্রমণে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করল, সন্তর্পণে খুঁজল পাপের চিহ্ন। তোমাদের সমাজ মৃত মানুষকেও আইনের মারপ্যাঁচ থেকে মুক্তি দেয় না। যখন আমার স্ত্রী-অঙ্গে ফরসেপ চালিয়ে ওরা শুনতে পেল না মৃত ভ্রূণের কান্না তখন নেহাত অবহেলায় আমাকে পাঠিয়ে দিল এই কবরে।

ভাবতে কত অবাক লাগে। ঠিক দু' দিন আগে এই মুহূর্তে শহরের নন্দিনীদের মধ্যে সবচেয়ে অহঙ্কারী এমিলি হোটেল মিকাডোতে তার অসংখ্য পুরুষ বন্ধুদের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে মত্ত ছিল বুরবনের নেশাতে। আর তার স্লিভলেশ আটোসাঁটো স্কার্টে'র অন্তরাল থেকে উপচে পড়া দেহের সুষমা হাজার হাজার লোভী চোখকে করছিল কাতর। আগুন রঙা পাতলা দুটি ঠোঁটে ভ্রমরের মত উড়ছিল কামুক পুরুষদের মত্ত পুরু ঠোঁট।

কিন্তু আজ, সেই এমিলি শায়িত আছে অনন্ত নীরবতার মধ্যে। আমি জানি আজও প্রতিরাতের মত হোটেল মিকাডোতে জমে উঠেছে অর্ধ নগ্ন নৃত্যের আসর। এবং হাজার হাজার মানুষ একটি রাতের উষ্ণতার জন্যে ভীড় করেছে সেখানে। এমিলির অবর্তমানে তারা কেউ মুহূর্তের জন্যে নীরব হচ্ছে না।

এই হল জীবন, লুসি, এর নাম যৌবন যন্ত্রণা।

তখন নিঝুম রাতে ঝুরুঝুরু তুষার যেন ককিয়ে ওঠে। এই বিস্তীর্ণ কবর ক্ষেত্রের মাথায় ঘন কালো আকাশে তাকিয়ে আছে অসংখ্য তারা। যতক্ষণ এমিলি কথা বলছে ততক্ষণ তার দিক থেকে

দৃষ্টি সরাতে পারে নি লুসি। ঐ দুটি চোখ যেন কি এক অজানা আকর্ষণে তার সমস্ত সত্তাকে আঁকড়ে রেখেছিল।

কিন্তু এখন কথা ফুরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে লুসির বোধ শক্তি ফিরতে থাকে। আর আত্মার মধ্যে তিন বছরের ফুটফুটে মেয়ে লুইজ্যার ক্রন্দন অথবা হাহাকার অথবা অভিশাপের গুমরে কাঁপা ধ্বনি প্রবল হয়ে ওঠে।

আর এমিলি? রাত কালো ম্যাক্সি পরিহিতা ঐ যৌবনা মেয়েটি এখন অদৃশ্য হয়ে গেছে তার চোখের সামনে থেকে। কালো ম্যাক্সি শূন্যে দাঁড়িয়ে আছে। লুসি চোখ বড় বড় করে তাকালো। এইবার তার সেই ঘুমন্ত ভয়ের ঘুম ভাঙছে।

শঙ্কা শিহরণের বোধ তাকে যেন আপ্লুত করে দেবে।

চোখের সামনে যে অদ্ভুত নাটক অভিনীত হচ্ছে, তার একমাত্র দর্শক লুসি এবার প্রাণ ভয়ে ছুটতে শুরু করবে।

কিন্তু কোথায় যাবে সে? দু মাথাওয়ালা জেনামের মত তাকিয়ে আছে ফেলে আসা অতীত আর অনাগত ভবিষ্যতের দিকে।

কোথাও এক বিন্দু আলো নেই। নেই বাঁচবার সামান্যতম প্রয়াস। যে দিনগুলো সে ফেলে এসেছে, তার চোদ্দ বছরের ক্লান্তিকর দিন যাপন, সেখানে সে পেয়েছে প্রিয়জনের ষড়যন্ত্র আর সমাজের অত্যাচার।

সামনে আছে যে দিনগুলো, তারা কি তার জন্যে জমা রাখে নি আরো বেশী অবিশ্বাস?

কিন্তু কোথায় পালাবে লুসি? প্রবল কুয়াশা আর তুষারপাতের ঘন আচ্ছাদন তার দিকে এগিয়ে আসছে হিংস্র শ্বাপদের মত। লোভে জিভ লকলক করে, চোখের কোণে চিক চিক করে আকাঙ্ক্ষা।

আর এমিলি? চোখের সামনে ভেসে উঠেছে একুশ তলা বাড়ী থেকে লাফিয়ে পড়া অভিশপ্ত আত্মার তালগোল পাকানো রক্তাক্ত দৃশ্য।

এই কি মানুষ? না কি মানুষের নামধারী কোন এক অজ্ঞাত প্রাণী? তারপর সেই অশরীরী আত্মা লুসির দিকে বাড়িয়ে দিয়েছে তার ক্ষুধার্ত হাত।

ভয়ে বিস্ময়ে লুসি দেখল সেই মানবিক হাতে নেকড়ের সুতীক্ষ্ণ নখর। আরেকটু হলেই টেনে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দেবে লুসিকে।

সে ছুটতে থাকে, পায়ের নীচে ফুটছে ছড়ানো হাড়ের তীক্ষ্ণ ফলা, মানুষের কঙ্কাল হাসছে তার চারপাশে, লুসি ছুটছে।

এই জীবন হারা জীবন্তদের আস্তানা থেকে তাকে এখুনি পালাতে হবে প্রাণের জন্যে।

প্রাণ তাকে ডাকছে। পৃথিবীর প্রথম প্রাণ, হিংস্র বিধ্বস্ত বিশ্বাসঘাতক সেই জীবন স্রোতে ভাসতে না পারলে আজ এখানেই সমাপ্তি ঘটবে তার জীবনের।

ঝনঝন করে যেন কাঁচ ভেঙ্গে গেল। সুদূর অরণ্যের মধ্যে হায়নার হাসি শোনা যায়। আর সেই ডাইনী আগুনের মধ্যে উড়তে উড়তে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগাল দিতে দিতে তার দিকে ধেয়ে আসে। কি বিরাট তার চেহারা। দুটি চোখে জ্বলছে আগুন।

ছুটছে লুসি, যেন আর পারছে না। ঠিক এক পা পেছনে ভাসতে ভাসতে উড়ে আসছে সেই মায়াবিনী।

সে কি শুধু মায়া? মরণ ছায়া? না কি তার অন্তরে প্রোথিত আছে এমিলার মত হাজার হাজার অভিশপ্ত রমণীর পিপাসার্ত আতঙ্ক?

ছুটতে ছুটতে লুসির অচেতন দেহটা ছিটকে পড়ে পথের ধারে। সেখানে কাঁটা উঠিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল রুগ্ন গাছেরা, তারা রক্তাক্ত দংশনে লুসির যন্ত্রণা বাড়িয়ে দিল।

ভীত সন্ত্রস্ত শিহরিত দুটি চোখের পাতায় এবার যেন ঘুম আসছে।

একটু ঘুম, তার দরকার, ভীষণ দরকার। না হলে সে ডুবে যাবে ঐ কোলাহলের মধ্যে।

শব্দ, শব্দ তাকে সর্বদা তাড়া করছে। এই পৃথিবীর সমস্ত শব্দকে সে যেন তার মনের মধ্যে শুনতে পাচ্ছে। সেই শব্দ আছে তার চেতনার মধ্যে নয়, আছে অবচেতন মনে, সে শব্দ সাধারণ মানুষের মনে প্রবেশ করে না সেই রহস্যময় শব্দের অতলে ডুবতে বসেছে লুসি

ঘুম, ঘুম নেমে আসে, লুসি যেন ক্যাকটাসের বিছানায় কুয়াশার মলিন চাদর গায়ে অবিরাম তুষারের মধ্যে পৃথিবীর আদিকন্যা হয়ে ঘুমুতে চায়।

কিন্তু ওরা তাকে শান্তি দেবে না, নিদ্রা দেবে না। ওরা সর্বদা তার বিধ্বস্ত চেতনাকে শব্দের আক্রমনে উত্তেজিত করবে। যাতে সে প্রতিমুহুর্তে অশান্ত আলোড়নে ছটফট করে মরে।

কি শব্দ?

যে সব মানুষ হারিয়ে গেছে পৃথিবী থেকে তাদের দৈনন্দিন জীবনের কুটিল অভিসন্ধি, জঘন্য ষড়যন্ত্র আর লোভী লালসার ফিস ফিস শব্দ। আছে শিশু হত্যাকারীর দল, যারা রক্তের লোভে হত্যা করে নবজাতক, যারা অবৈধ সঙ্গমে জন্ম দেয় জারজ সন্তান, যারা ক্ষমতার লোভে বিচরণ করে কালো বাতাসের মধ্যে। যারা সুখের সন্ধানে প্রিয়জনের ঠোঁটে তুলে দেয় মৃত্যু-বিষ, তাদের শব্দ লুসিকে গ্রাস করে।

ভুগর্ভের অতল হতে, বাতাসহীন রৌদ্র বিহীন প্রকোষ্ঠ থেকে মন্ত্রিত আত্মার কথা শোনা যায়··· লুসি, গত জন্মে তুমি ছিলে আগাথা। নিজের বিকৃত ইচ্ছাতে নিরপরাধ স্বামীর মুখে পরম বিশ্বাসে তুলে দিয়েছিলে বিষাক্ত মদের পাত্র।

এ অভিযোগ অস্বীকার করার মত ক্ষমতা আছে কি লুসির?

···তার আগের জন্মে তুমি ছিলে ইরাকের কুৎসা কলঙ্ক আর কেচ্ছা দিয়ে গড়া জগতের মক্ষিরাণী।

লুসি জানে এই অভিযোগের সত্যতা। তাই সে নীরবে তার পরাজয় মেনে নেয়। শুধু বলে, কাতর স্বরে, অনুনয়ের অসহায় ভঙ্গিমাতে—দোহাই তোমাদের, যুগ যুগান্ত ধরে বহমান অভিশপ্ত আত্মার দল, তোমরা আমাকে একটু ঘুমোতে দাও।

হয়তো ওরা তার আকুল আকুতি শুনে স্তব্ধ হয়ে যায়। কিন্তু লুইজ্যা? লুসি কি জানে কি প্রচণ্ড যন্ত্রণাতে ১৫০ মাইল বেগে ধাবিত মোটরের তলায় দলিত লুইজ্যার দেহ এখন কাতর...

আজ সেই ছোট্ট শিশুটি তার তর্জনী তুলে সমস্ত অভিশাপ ঢেলে দিচ্ছে লুসির দিকে। সেই অভিশাপ বিষের মত আক্রমণ করবে লুসিকে। ক্রমশঃ সে নীল হয়ে যাবে।

লুসির ক্ষণস্থায়ী তন্দ্রা ভেঙে গেল, অবাক হয়ে সে দেখল যেখানে তার বিধ্বস্ত দেহটা আছড়ে পড়ে ছিল সেখানে শায়িত আছে সেই অদৃশ্য কবরে, যেখানে পাথরের চোখে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত।

ধীরে ধীরে সেই বিন্দু বিন্দু রক্ত জমাট বেঁধে পরিণত হয় একটি রক্তরেখায়। সেই রক্ত রেখা গড়িয়ে পড়ে তৃষিত পিছল মাটিতে।

অযত্নে বর্ধিত আগাছাতে ঢেকে গেছে কবর। লুসির মনে হল সে যেন এগিয়ে গেছে কয়েক শতাব্দীর পরের পৃথিবীতে।

একহাতে তার কোদাল, অন্য হাতে একটি মোমবাতি। সে মাটি কেটে প্রবেশ করছে বহু বছর আগে মৃত লুইজ্যার সমাধিতে। সেই কালো কাঠের কফিন, যার মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণা বুকে নিয়ে শুয়ে আছে একটি অতৃপ্ত মেয়ে।

লুসি ডালা খুলে দিল। মোমবাতির মৃদু আলোয় দেখা গেল শ্যাওলা ধরা কুঠুরি আর তার মধ্যে শায়িতা একটি ছোট্ট মেয়েকে।

লুইজ্যা, তার প্রথম শিকার। জিভ দিয়ে ঠোঁট চেটে নিল লুসি, পিপাসার্ত, সহসা রক্ত পানে উৎসুক হয়ে উঠেছে।

লুসির মনে হচ্ছে এই মেয়েটিকে সে গ্রাস করবে, তার অস্থি মজ্জা মাংসকে আত্মস্থ করবে। তারপর ফেলে দেবে তার রক্তহীন

দেহটাকে। লুসি ধীরে ধীরে তার মুখ নামিয়ে আনে। দুজনের মধ্যে ব্যবধান ক্রমশঃ কমে আসে, এক দমকা বাতাসে মোমবাতিটা হঠাৎ নিভে যায়, কিন্তু সেই কফিনের ডালা সশব্দে আছড়ে পড়ে লুসির মাথায়।

অন্তিম মুহূর্তে সে আর্তনাদ করে ওঠে। কাঠের কফিন যেন তাকে বন্দী করেছে। সে লাথি মারে, বেরিয়ে আসতে চায়, পারে না।

অবশেষে ছোট্ট কাঠের কফিনে শিকার আর শিকারী পাশাপাশি শায়িতা থাকে মৃত্যু শয্যায়। ধীরে ধীরে তারা পরিণত হয় জীবন-হীন কঙ্কালে।

### শয়তান শৃগালের জিঘাংসা

তখন হেনরীর ঘরে দপ দপ করে জ্বলছে ড্রাগনের চোখে দুটি লাল আলো। হেনরী একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে ক্লারার চোখের দিকে। ক্লারাকে সে সম্মোহিত করবে, তার বিকৃত আত্মাকে নিজের ইচ্ছানুসারে পরিচালিত করবে। কেননা আজ সকাল থেকে ক্লারা তার কথা মত কাজ করতে গিয়ে অমনোযোগী হয়ে পড়েছে।

চার জোড়া চোখ পরস্পরকে লেহন করতে চায়। এখন চলেছে ক্লারা আর হেনরীর ইচ্ছা শক্তির লড়াই। অনেকক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকার পর চোখের পলক ফেলে দেয় ক্লারা। তখনই জয়ের আনন্দে উল্লসিত হয়ে নেচে ওঠে হেনরীর মন। সে চীৎকার করে স্তব্ধ বাতাসে ঘূর্ণন তুলে বলতে থাকে—ক্লারা, ক্লারা, তুমি হেরে গেলে, তুমি মানবী, পুরুষের অদম্য ইচ্ছা শক্তির কাছে তোমার পরাজয় হবেই।

ক্লারা নতমুখে বসে আছে। ঘরে কোন আলো নেই। আলো

থাকলে দেখা যেত যে ক্লারার দেহের কোথাও এতটুকু আবরণ নেই। পোষাক হল আত্মার অপমান।

এবার হেনরী তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আর তৃতীয় নয়নের সাহায্যে ক্লারার আন্দোলিত সত্বাকে অনুগত করবে।

পাশে শোয়ানো আছে একটি ঘন কালো বেড়াল, তাকে হত্যা করে হেনরী আত্মার ওজন নিয়ে গবেষণা করবে। সে ক্লারার হাতে তুলে দিল একটি তীক্ষ্ণ ছুরিকা।

তারপর গম্ভীর কণ্ঠে আদেশ করে—আমার চোখের দিকে তাকাও।

চেতনাহীন জড়ের মত ক্লারা চেয়ে দেখল তার চোখের দিকে। সেই চোখের দৃষ্টি ভাষাহীন পলক পড়ছে না। যেন পাথরের ষ্ট্যাচু তাকিয়ে আছে।

—উঠে দাঁড়াও।

পাতাল ঘরে কেঁপে উঠে গুমগুম শব্দ।

স্বপ্নোত্থিতের মত উঠে দাঁড়ায় ক্লারা। তার দেহের কোথাও এতটুকু বাড়তি মেদ নেই। এখন সে সম্পূর্ণ নগ্না। কিন্তু তাকে দেখে হেনরীর মনের কোথাও ছোবল মারছে না লালসার পাপ।

কেননা ক্লারাকে দেখে মনে হচ্ছে সে যেন মিশরীদের প্রাচীন দেবতা অ্যানুবিস। অগণিত শতাব্দী ধরে তার বিহ্বল দুটি আঁখি অন্ধকারে চেয়ে আছে। সহস্র যুগের ধুলিকণা জমে উঠছে তার পাথরের ভ্রু ভাঁজে। ক্ষুধার্ত কুকুরের মত তার মূর্তি কোথাও কোথাও ভেঙে পড়ছে।

কিন্তু মূর্তির পাথরের ঠোঁট দুটো এখনও কুকুরের মত দাঁত বের করে দুর্বোধ্য, রহস্যময় হাসিতে কুঁকড়ে আছে।

হঠাৎ দেখলে মনে হবে পাথুরে মূর্তিটা যেন চেয়ে আছে। যেন ছায়া ঘন শতাব্দীর পর শতাব্দীর অপস্রিয়মান শোভাযাত্রা দেখছে। এবং নিহত শতাব্দীর সঙ্গে বিদায় নিয়েছে প্রাচীন মিশরের দীপ্তি ও উজ্জ্বলতা এবং প্রাচীন মিশরের দেবতারা।

হয়তো তাই সে দাঁত বার করে জাগছে। পুরোনো দিনের জাঁকজমক, নিশ্চল, অসার ও বিনষ্ট গৌরবের স্মৃতি তার হাসি আনে।

মৃত্যু এখানে সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। যে ছায়া ঢাকা পাতাল পথের ভেতর মূর্তিটা দাঁড়িয়ে আছে, সেখানে মৃত্যুর প্রেতার্ত ছায়া। মমীভূত মৃতদেহের শবাধারের আড়ালে লুকিয়ে আছে মৃত্যু। পাথুরে মেঘের ধূলোর আড়ালেও মৃত্যু দিন গুনছে।

মৃত্যু এবং অন্ধকার—যে অন্ধকারকে গত তিন হাজার বছর আলো ছুঁতে পারেনি।

কিন্তু আজ সেই হাজার বছরের অন্ধকারের মধ্যে তাকিয়ে থাকা শৃগাল দেবী অ্যানুবিসের চোখে আলো এসেছে। সেই আলো তার পদচিহ্ন এঁকেছে স্পর্শ কাঞ্চন শব্দের মধ্যে। সে শব্দ পাতাল পথের শেষে মরচে ধরা লোহার দরজার ওপর অশান্ত তরঙ্গের মত আছড়ে পড়েছে।

……তাকিয়ে আছে ক্লারা……। দপদপ করে জ্বলছে ড্রাগনের চোখ……জ্বলছে আবার নিভছে……

সামনে ঘন কালো পোষাকে ঢাকা হেনরীর দেহের কোথাও এক বিন্দু মানবিক আবেদন নেই। সে যেন কোন অজানা মন্ত্রশক্তিতে শক্তিমান হয়ে উলঙ্গ ঐ রমণীকে হাত ধরে শেখাবে প্রেতাত্মার বর্ণমালা। তাকে বিশ্বাস করাবে যে নরনারীর প্রেম হল কুয়াশার মত বিলীয়মান, মরা পাতার মত অর্থহীন……।

সেই প্রেম মানুষকে আরো বেশী স্বার্থান্বেষী এবং দুর্বল করে তোলে।

রাতের পর রাত বিছানাতে ঝড় তুলে যে সহবাস, তার মধ্যে ঘুমিয়ে আছে বিবর্ণ আনন্দ। সেই অবুঝ মানুষকে পাতালের দিকে আকর্ষিত করে, তার হৃদয়কে উন্মোচিত করে না।

ক্লারা তাকিয়ে আছে……।

যেন অ্যান্নুবিসের মুখের ওপর তিন হাজার বছর পরে প্রথম আলো পড়ল।

শেষবার আলো জ্বেলেছিল বাষ্টের মিশরীয় পুরোহিতের হাতে পবিত্র দীপবর্তিকা। শেষবার ধূলোর ছাপ রেখেছিল মিশরীয় পাদুকায় তাজা মানুষের পা। শেষবার কথা বলেছিল নীল নদের দেশের প্রার্থনার ভাষায় সেদিনের মানুষ।

ড্রাগনের চোখে জ্বলা লাল আলোতে দেখা গেল লোকটিকে। লম্বা, রোগা। ওর কাঁপা কাঁপা হাতে ধরা প্যাপিরাসের শুকনো পাতায় লেখা প্রাচীন পুঁথির মত ওর মুখেও অজস্র ভাঁজ। ওর মাথায় সাদা চুল, বসা চোখ এবং হলুদ হয়ে আসা চামড়া দেখে বোঝা যাচ্ছে, লোকটা বুড়ো হয়েছে। কিন্তু ওর পাতলা ঠোঁটের হাসিতে যৌবনের দম্ভ।

কে সেই লোকটি ?

সে হলো হেনরী, এই মুহূর্তে তার যৌবনের লালিত্য হারিয়ে গেছে কৃত্রিম আরোপিত বার্দ্ধক্যের আবরণে। এটাই হয়তো তার আসল চেহারা।

সে মুখটা আমরা সবাই চিনি সেটা হল তার মুখোশ। ক্লারার মূর্তির দিকে তাকিয়ে বৃদ্ধ হেনরীর চোখে ফুটে ওঠে ভয়। পাতাল-পথের আবছা আলোয় অসীম ও নিরঙ্কুশ ক্ষমতার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে শৃগাল-দেবতা। জল হাওয়ায় ক্ষয়ে যাওয়া তার অতিকায় পাথুরে শরীরে এখনো পুরোনো দিনের জমকালো আড়ম্বর এবং যুক্তিহীন বিভীষিকার রেশ জড়ানো।

কিন্তু এ তো পাতাল ঘর নয়। শহর নিউ ইয়র্কের একুশ তলার একটি ঘর।

কেন সেখানে ছুটে আসে, বার বার ছুটে আসে, নিহত শতাব্দীর প্রেত ?

সে ভয় দেখায়। তার দাঁত দেখা যায়, তার চোখ দেখা যায়।

হয়তো বিনা অনুমতিতে অনাহুত মানুষের অবাঞ্ছিত প্রবেশে ক্রুদ্ধ-বিরক্ত সে। তাই চীৎকার করে, বুনো শেয়ালের মত আর্তনাদ করে জানাতে চাইছে তার রাগ।

ক্লারা এবার আচ্ছন্নের মত এক পা এক পা করে হাঁটছে হেনরীর দিকে। তার মনে সম্মোহনের শেষ পর্যায়ে হেনরী এখন তাকে স্পর্শ করবে।

এখন মধ্য রাতে, একুশ তলার ঘরে, ঝির ঝির তুষারের মধ্যে একটি সক্ষম পুরুষ আর অনাবৃতা রমনী শরীরের কাছাকাছি এগিয়ে আসছে। কি আশ্চর্য, তাদের মধ্যে জেগে নেই এক বিন্দু লালসা। তাদের একজন শিকারী কুকুরের মত অনুসন্ধানী, অন্যজন ভীতা হরিণীর মত চঞ্চলা অথচ স্থির।

অ্যানুবিসের শৃগাল চোখে মৃত্যুর ছায়া কাঁপে। তার পাথুরে শরীরের চারপাশে কেমন যেন অশুভ ইঙ্গিতে নিরুদ্ধ বাতাসে ছড়িয়ে আছে। যেন তার শরীরে পাশবিক এক মনুষ্যত্বের অদৃশ্য সংকেত। যেন পাথরের আড়ালে লুকিয়ে আছে গোপন সংবেদনশীল জীবন। পাথর খোদা মুখে সবজান্তা হাসিটায় মানুষের সততা সম্বন্ধে সন্দেহ, চোখ দুটো যদিও পাথরের, চোখের আড়ালে যেন এক আশ্চর্য এবং আলোড়ন জাগানো চেতনা লুকিয়ে আছে। যেন স্ট্যাচুটা বেঁচে আছে। কিংবা বুঝি স্ট্যাচুর পাথুরে পোষাকের আড়ালে লুকিয়ে আছে জীবন।

ক্লারার হাতে হাত রাখল হেনরী।

মনে হল যেন দুটি শতাব্দী এসে করমর্দন করল।

শৃগালদেবী অ্যানুবিস বুঝি কথা বলতে চায়। পাথরের পাতাল ঘরে হাজার হাজার বছর বন্দিনী থেকে সে আজ চীৎকার করে উঠতে চায় এই পৃথিবীতে।

শুধু কি অ্যানুবিস?

কেন সেখানে আছে সমস্ত অমঙ্গলের উৎস আমন-রা…।

আছে বিষাক্ত সাপের শরীর নিয়ে দেবতা শেট···।

আছে বেড়াল মাথা দেবতা বুব্যাসটিস···।

পিরামিডের সামনে, জমির পাশে, স্প্রিংসের পেছনে ছড়িয়ে আছে তারা....। সারি সারি···

সব কিছু ছাপিয়ে এখানে মৃত্যুর হাওয়া। দীর্ঘদিন মৃতরা নিষিদ্ধ সংকেতে অদৃশ্য ইঙ্গিতে রক্তের ভেতর হাতছানি দেয়।

তাই মিশরে জন্ম দিয়েছে কুহকিনী বিদ্যার। এই মুহূর্তে হেনরি সেটা পড়ছে, আপাততঃ দুর্বোধ্য হলেও তাতে আছে কুহক, যাদু, ডাকিনী বিদ্যা এবং অশুভ আতঙ্কের অস্পষ্ট অশরীরি ইঙ্গিত।

আজ এতদিন বাদে, সেই প্রেত পাণ্ডুলিপির সাহায্যে ক্লারারে প্রেতায়িত করতে চাইছে হেনরী।

তার অশরীরী সত্বার সঙ্গে প্রতি মুহূর্তে সংঘর্ষ ঘটছে ক্লারাকে শরীরী সত্বার।

কিন্তু হাজার বছরের বিবর্ণ ধুলিমলিন ঐ অপার্থিব পাণ্ডুলিপি পড়তে পড়তে আরোপিত বার্দ্ধক্যে জর্জর হেনরীর মনে হল কে যেন তাকে অজ্ঞাতে অনুসরণ করছে।

কে সে?

সে কি শৃগাল মুখ দেবী অ্যানুবিস? যে সারাজীবন ধরে হাহাকারের মধ্যে আগলে রেখেছে পাতালপুরীর প্রবেশ পথ?

তাই অনধিকার অনুপ্রবেশে বাধা দিতে চায়?

কিন্তু হেনরী তার সমস্ত জীবন দিয়ে ঐ প্রেতাত্মাকে গ্রহণ করতে চেয়েছে। সে ভেবেছে প্রেতিনীবিদ্যায় হবে সকলের সেরা।

তার শীর্ণ হাতে বিবর্ণ প্যাপিরাসের পাতা কাঁপতে থাকে, শোনা যায় ঘনীভূত নিষিদ্ধ ফ্লারাও আখোনটোমেনের কান্না। বুঝি অভিশপ্ত যৌবনা ক্লিওপেট্রা অপার্থিব শিহরণে হেসে ওঠে।

ঠিক যখন ক্লারার নগ্ন দেহটি সশব্দে আছড়ে পড়ল হেনরীর পায়ের সামনে।

হিমেল হাওয়ার মধ্যে বেজে ওঠে হাজার হাজার বছরের পুরোনো বিকৃত কণ্ঠস্বর।

…তোমরা যারা ডাকিনী বিদ্যা নিয়ে অন্বেষণ করতে চাও তাদের উদ্দেশ্যে বলছি ? মনে রেখ, এই বিদ্যার সামান্যতম অবমাননা হলে নিশ্চিত মৃত্যু তোমাকে গ্রাস করবে। জেনো, মহান দেবতা অ্যান্নুবিস তোমাকে ঢুকতে দেবে না। যদি ঢুকতে দেয় তবু অপবিত্র অবিশ্বাসী অনুপ্রবেশকারী মানুষেরা পৃথিবীতে ফিরে যেতে পারবে না। কারণ অ্যান্নুবিসের এই মুর্তি রহস্যময় এবং তার অন্তরালে লুকিয়ে আছে এক গোপন রোমাঞ্চিত অস্তিত্ব।

হয়তো কোন কারণে সামান্য ভুল করেছিল হেনরী। তাই অ্যান্নুবিসের ক্রোধ এখন তাকে আক্রমণ করেছে।

তার এই ঘরে স্থাপিত সাতজন প্রাচীন প্রাগ-ঐতিহাসিক মিশরীর দেবতার মাথা—আসিরিস, আইসিময়া, বাষ্ট, থথ, সেট এবং অ্যান্নুবিস।

সাতজন দেবতার চোখে ঠিকরে আসে এক ধরণের দুর্বোধ্য ঘৃণা, যা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না।

সেই ঘৃণা অদৃশ্য শেকড়ের মত হেনরীর সত্বাকে আকর্ষণ করছে, তার মস্তিষ্কের মধ্যে ছড়িয়ে যাচ্ছে অবর্ণনীয় অনুভূতি, যেন সেই শেষের ভয় ছাড়া আর অন্য সব অনুভূতিকে শুষে নিচ্ছে।

এই ভয়ের একটা কারণ, হঠাৎ দেখলে মনে হয় যেন মুর্তিটা প্রতি মুহুর্তেই বদলে যাচ্ছে, গলে যাচ্ছে, একটা অবর্ণনীয় আকার থেকে আর একটা বর্ণনার অতীত আকারে রূপ নিচ্ছে।

বিশেষ একটা কোণ থেকে দেখলে মুর্তিটা যেন একরাশ জড়াজড়ি করা সাপ, মেডুসার মুর্তির মত। অথচ দ্বিতীয়বার দেখলে মনে হয় মুর্তিটা যেন একরাশ উজ্জ্বল রক্তচোষা ফুল, সাপের জেলির মত প্রোটোপ্লাজমে পাপড়িগুলো রক্তের তৃষ্ণায় বড়ো হয়ে ওঠে। তৃতীয়বার ভালো করে দেখলে মনে হবে, না, এসব কিছুই নয়, শুধু

অনেকগুলো রুপোর করোটির বিশৃঙ্খল সম্মেলনে অবয়বহীন এক প্রতীকি মূর্তি। কিন্তু আবার ভালো করে তাকালে বোঝা যাবে, মূর্তির আড়ালে মহাবিশ্বের এক গোপন প্যাটার্ন—

গ্রহনক্ষত্রেরা এমনভাবে সংকুচিত এবং সংনমিত যে গ্রহনক্ষত্রের বাইরে মহাশূন্যের বিশালতার ইঙ্গিত পাওয়া যায়!

কোন শয়তানী শিল্পবিদ্যা ঐ দুর্বোধ্য দুঃস্বপ্নকে জন্ম দিয়েছে, হেনরী বুঝতে পারে না। এই প্যাটার্ন কোন মানুষ-শিল্পীর সৃষ্টি কিনা তাতেও সন্দেহ হয়। হয়তো দরজার এই মূর্তিটার কোন ভয়াবহ প্রতীকি তাৎপর্য আছে। হয়তো অদ্ভুত শরীরের পটভূমিকায় এই প্রকাণ্ড মাথাগুলো মানুষের সব দেবতার অন্তরালে যে গোপন সন্ত্রাস লুকিয়ে থাকে, তারই সাক্ষ্য দিচ্ছে। যতোই দেখছে হেনরী, ডিজাইনের জটিল গোলকধাঁধায় তার মন জড়িয়ে পড়ছে। মূর্তিটা তার মন কেড়ে নেয়, তাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে। মূর্তির দিকে ক্ষণিক তাকালে জীবনের অর্থ ও তাৎপর্যের চিন্তা মনে আসে, সেইসব ভয়াবহ চিন্তা, যা দার্শনিককে উন্মাদ করে দেয়।

হেনরী এবার দুহাতে মাথা ঝাঁকাতে থাকে, তার মনে পড়ে যায় কয়েকমাস আগের কথা, যখন সে মরুভূমিময় মিশরে অন্বেষণ করছিল সুপ্রাচীন কুহকিনী-বিদ্যার গোপন তন্ত্রাবলি।

যখন সেখানে ক্লারা প্রচণ্ড গরমের রাত্রে বালিতে লেপন করেছিল সদ্য মৃত শিশুর রক্ত, দুহাতে সেই রক্ত মেখে উল্লসিত হয়েছিল, তখন আকাশ থেকে কালো বাদুড়ের ঝাঁক অশুভ চিৎকার করতে করতে উড়ে যায়।

এখন তার মনে হচ্ছে সেই বাদুড়ের দল ছিল মূর্তিমান বিভীষিকার মত।

কিন্তু এখানে কেন?

এতো পাতাল পুরীর গভীর স্যাঁতসেঁতে ছাতা ধরা পূতি গন্ধময় নির্জন নিস্তব্ধ প্রকোষ্ঠ নয়। তবু কেন কুঞ্চিত নাকে ভেসে আসে

শুধু গন্ধ। কবরখানার লাস পচা তীব্র দুর্গন্ধ যেন। এই গন্ধ বুঝি মৃত্যুর ঘনীভূত নির্যাস, ছাতাধরা গুঁড়ো গুঁড়ো ধুলির মিশ্রণ।

চোখের সামনে থেকে অ্যান্নুবিসের রূপোলি করোটি অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে ঝন ঝন করে ধাতব শব্দ তুলে দরজার পাল্লা ঘোরে। দরজা খোলার শব্দ ভেতরের পাতালপুরীর ছাতা-পড়া দুর্গন্ধ গভীরে ধ্বনি প্রতিধ্বনি ছড়ায়।

প্রথম আতঙ্কের রেশ কেটে যেতে হেনরী কথা বলে। কিন্তু তার কথা শুনবে কে?

তার একমাত্র সঙ্গিনী এখন অচেতন হয়ে শুয়ে আছে মেঝেতে। তবু নিজের মনে বিড়বিড় করে বকতে থাকে আরোপিত বার্দ্ধক্যে শীর্ণ হেনরীর বিবর্ণ দুটি ঠোঁট—শোন, তোমরা সবাই শোন, এখনো আমি ডাকিনী বিদ্যার কিছুই শিখতে পারি নি। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি বিজ্ঞানের সীমানার বাইরে আছে অদৃশ্য ছায়াময় কুহকিনী বিদ্যার জগত। সেই জগতে ছেয়ে আছে অন্ধকার, শুধু অন্ধকার। সারা জীবন ধরে আমি অশুভ আত্মার ঘুম ভাঙিয়ে তার কাছ থেকে জেনে নেব প্রেত দেবতার দুঃশাসনের ইতিহাস।

আমার এই কাজে সঙ্গী হবে তুমি—

নিজের কথাকে অসমাপ্ত রেখে হেনরী হঠাৎ হাঁটু মুড়ে বসে ক্লারার সামনে, তার শীতল দেহটাকে প্রবল ঝাঁকুনি দিতে দিতে বলে—আমার এই কাজে তুমি হবে সঙ্গিনী। তোমাকে সঙ্গে নিয়ে আমি দীর্ঘ রাত অতিবাহিত করব বিবর্ণ প্যাপিরাসের পাতায় লেখা প্রেততত্ত্বের মন্ত্র উচ্চারণে। তোমাকে সাথী করে হেঁটে যাবো পৃথিবীর দেশে দেশে ছড়ানো রহস্যময় সমাধির সন্ধানে।

…প্রেম, আমি ঘৃণা করি, যে প্রেম অনন্ত জীবনের সন্ধান দেয় না, তার প্রতি আমার সামান্যতম আকর্ষণ নেই। আমি ভালোবাসি মৃত্যু। তোমাকে পাশে পেলে আমি সেই মহান মৃত্যুকে তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করবো।

…আমি বিশ্বাস করি পৃথিবীর মানুষের পরিচিত চেতনার বাইরে বিরাজ করে অতি প্রাকৃত জগত।

তাদের সন্ধান আমরা জানি না। কিন্তু আজ সময় এসেছে, সেই অজ্ঞাত জগতের সম্রাট হবার ডাক এসেছে।

…ক্লারা, শোন হয়তো ওই সমাধির আড়ালে আমরা এমন কোনো রহস্য খুঁজে পাবো, যা আমাদের পৃথিবীর অধীশ্বর করে দেবে, হয়তো আমরা পাবো মৃত্যুবহ কোন রশ্মি, মারাত্মক অথচ ধীরে ধীরে কাজ করে এমন কোন বিষ, এমন কোন শক্তিশালী মন্ত্র যা উচ্চারণ করলে সেই আদিম প্রেতদেবতাদের শাসন ফিরে আসবে।

ক্লারা, ভেবে দেখ, একবার এমনি সব রহস্যের খোঁজ পেলে আমরা কি না করতে পারি। আমরা সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করবো, রাজ্য শাসন করবো, আমাদের নবলব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে শত্রুদের ধ্বংস করবো। এছাড়া আমরা পাবো মণিমুক্তো, কল্পনার অতীত ঐশ্বর্য্য, সহস্র সম্রাটের সঞ্চিত ধন!

তখনো উন্মাদের মত ক্লারার দেহটি ঝাঁকিয়ে চলছে হেনরী।

একবার তার মনে হয়, উন্মত্ত আবেগের তাড়নায় সে ভাবে এই পাতাল ঘর থেকে সে পালিয়ে যাবে। কেননা দীর্ঘদিন এখানে বন্দী থেকে, কুহকিনী বিদ্যার দুর্বোধ্য মন্ত্রের মধ্যে নিজের সমস্ত সময়কে আবদ্ধ রেখে হেনরী যেন ক্লান্ত হয়ে গেছে। সে পালিয়ে যাবে স্বাভাবিক মাটির পৃথিবীতে। যেখানে এখনো জ্বলছে সূর্যের আলো। এখনো তার তপ্ত কপাল ছুঁয়ে যাবে মরু বাতাস, যে বাতাস অজস্র মৃত শতাব্দীর ধুলোয় দূষিত নয়।

কিন্তু সে কি আর পালাতে পারবে? মনে হয় আর কোন দিন সে ফিরতে পারবে না সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে?

কেন না সে যে দেখেছে সম্মোহিত আত্মাকে। তাই সরল মানুষ হওয়া আর সম্ভব হবে না।

অ্যানুবিসের শৃগাল মুখের দিকে চোখ পড়ে তার। সে বিড় বিড়

করে বলে—আমি জানি এখন আমাকে কি করতে হবে। নিজেকে আমি সম্মোহিত করবো, আমি, আমার সমাধিস্থ আত্মা বা চেতনা স্ট্যাচুর পাথরের শরীরে ঢুকবে। পাথর জেগে উঠবে, ষ্ট্যাচু ঘুরবে, আমাদের রাস্তা খুলে যাবে—

কিন্তু অভিশাপ? হেনরী অব্যক্ত স্বরে বলতে থাকে, আমি জানি এ জীবন অভিশপ্ত।…

…ড্রাগনের চোখ জ্বলে....অ্যান্থুবিসের চোখে আলো পড়ে… নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে হেনরী দেখছে, বারো ফুট উঁচু ষ্ট্যাচু, শিয়ালের মত মুখ, বিস্তারিত দুটো পাথরের চোখ, যে চোখের আড়ালে গোপনে জীবনের ইঙ্গিত তাদের মনে আতঙ্ক জাগিয়েছে।

সে এক ভয়ংকর দৃশ্য। মাটির নীচে নিকষ কালো পাতালপুরীতে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দুটো মানুষ এবং অশুভ মিশরীর প্রেত দেবতার সামনে সাইক্রিয়াটিষ্ট হেনরীর ঠোঁট দুটো কাঁপছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগে মিশরীর প্রেত পুরোহিত তার অশুভ দেবতার উদ্দেশ্যে যে ভাষায় প্রার্থনা জানাতো, সেই একই ভাষায় বিড়বিড় করে প্রার্থনা জানাছে হেনরী। লণ্ঠনের আলোয় একটা ছায়াঘেরা বৃত্ত দেবতার শৃগাল মুখের ওপরে পড়েছে। সেদিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে বুড়ো মানুষটা।

আস্তে আস্তে তার চোখের তারা দুটো ঘষা কাঁচের মতো হয়ে যায়। শকুনের চোখের মত বুড়োর চোখেও পলক পড়ছে না। দুচোখের মণিতে যেন আগুনের লেলিহান শিখা ধিক ধিক জ্বলছে। দেখতে দেখতে হেনরীর শরীর শিথিল হয়ে আসে। যেন অদৃশ্য এক হিংস্র ভ্যাম্পায়ার তার শরীরের সব রক্ত শুষে নিচ্ছে।

মিনিটের পর মিনিট নিঃশব্দে কেটে যাচ্ছে, মৃত্যু যেখানে সম্রাট, সময় সেখানে মূল্যহীন।

হেনরী আর ভাবতে পারে না। রুদ্ধ আবেগে থর থর করে কাঁপছে তার চেতনা।

আজ মধ্য রাতে তার দীর্ঘ দিনের অর্জিত জ্ঞানের পরীক্ষা হচ্ছে।

সে কি এই শতাব্দীর মানবীয় শরীর নিহত শতাব্দীর মিশরীয় দেবতার শরীরে ঢোকাতে পারে ?

এবং যদিই বা পারে···

অভিশাপের কি হবে ?

অভিশপ্ত কবর, অবিশ্বাসী সেখানে ঢুকতে পারে না। প্রশ্ন দুটো অশ্রুত স্বগত কণ্ঠস্বরের মতো তার অস্তিত্বের আড়ালে জাগে। কিন্তু প্রচণ্ড ভয় সেই কণ্ঠস্বরকে চেপে রাখে।

ভয়-উন্মাদ এক সঙ্গীতের মুর্ছ্না উচ্চতম ধাপে পৌছায়।

যখন তার চোখ দুটো নিভে আসা আগুনের মত কেঁপে নিভে যায়, সে অজ্ঞান হয়ে যায়।

কিন্তু তার সামনে বারো ফুট উঁচু অ্যান্নুবিসের ষ্ট্যাচুর চোখদুটো আর পাথরের চোখ নয়।

ষ্ট্যাচুর চোখদুটো এখন মানুষের চোখের মত জ্বলছে!

হেনরী জানে আত্ম সম্মোহনের প্রক্রিয়ায় তার আত্মা অ্যান্নুবিসের মধ্যে ঢুকছে।

কথাটা ভাবতে ভাবতে শীতল বিভীষিকায় সে আঁৎকে ওঠে। মনে হয় যেন এখানে শ্বাস নেবার মতো বাতাস নেই।

সে কি মারা গেছে ?

প্যাপিরাসের পাণ্ডুলিপির শেষে কটি কথা মনে পড়ে যায় তার।

কিন্তু সাবধান!

মনে রেখো, যারা আমাদের ধর্মমতে বিশ্বাস করে না, তারা যদি ওই সমাধির ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করে, মনে রেখো, নিশ্চিত মৃত্যু ওখানে তোমার জন্মে অপেক্ষা করছে। যরি মহান দেবতা অ্যান্নুবিস তোমাকে ভেতরে ঢুকতেও দেয়, তবে অপবিত্র অবিশ্বাসী অনুপ্রবেশ-

কারী, মনে রেখো, তুমি মানুষের পৃথিবীতে ফিরে যেতে পারবে না। কারণ অ্যানুবিসের এই মূর্তি রহস্যময় এবং তার অন্তরালে লুকিয়ে আছে এক গোপন রোমাঞ্চিত অস্তিত্ব।

গোপন অস্তিত্ব।

অশুভ দেবতার গোপন আত্মা।

হাতটা তুলে ষ্ট্যাচুর মুখটা আবার দেখে হেনরী।

পাথরেব মুখ মুখোশের মত, শিয়ালের মত হিংস্র দাঁত খিঁচিয়ে আছে অ্যানুবিস। কিন্তু চোখ দুটো এখনো মানুষের চোখ। মানুষের চোখে পাপের হিংস্র জঘন্য অশুভ জিঘাংসা।

দেখতে দেখতে হেনরী যেন পাগল হয়ে যায়। সে আর ভাবতে পারছে না। সে শুধু জানে, তার ক্লারা মরে গেছে। কোন এক প্রক্রিয়ায় তার ক্লারাকে খুন করে ষ্ট্যাচুটা বেঁচে উঠেছে।

উন্মাদের মত প্রচণ্ড চীৎকার করে হেনরী ছুটে যায়; পাগলের মত ষ্ট্যাচুর পাথরের গায়ে ঘুষির পর ঘুষি মারে। তার হাতের চামড়া ছুঁড়ে যায়, রক্ত ঝরে পড়ে, অ্যানুবিসের ঠাণ্ডা পাথুরে পা গুলো সে নখ দিয়ে আঁচড়ায়। অ্যানুবিস তবু নড়ে না। কিন্তু ষ্ট্যাচুর চোখ দুটো এখনো মানুষের চোখের মত জ্বলছে।

প্রলাপ, মস্তিষ্ক বিকৃতি, ডেলিরিয়মের ঘোরে পাথরের ষ্ট্যাচুকে চীৎকার করে অভিশাপ দিচ্ছে মানুষ। কণ্ঠস্বরে তীব্র মানসিক যন্ত্রণার আভাস। অস্পষ্ট গলার দুর্বোধ্য আওয়াজ করতে করতে হেনরী ষ্ট্যাচুর পাথুরে শরীর বেয়ে ওপরে উঠতে থাকে।

কুড়ি ফুট উঁচু ষ্ট্যাচু। মানুষটা পাথর বেয়ে উপরে উঠছে। তাকে দেখতে হবে, জানতে হবে কি আছে অশুভ ওই দৃষ্টির আড়ালে। সেই অতি প্রাকৃত অস্তিত্বকে সে হত্যা করবে। পাথর বেয়ে উঠতে উঠতে ফুঁপিয়ে কেঁদে হেনরী ক্লারাকে বার বার ডাকছে। দুঃখে, দুঃসহ যন্ত্রণায়।

কুড়ি ফুট উঁচু ষ্ট্যাচুর মাথায় মুখোমুখি উঠতে ঠিক কতক্ষণ

লেগেছে সে জানে না। দুঃস্বপ্নের রক্তাভ আভা শেষ মুহূর্তগুলিকে ঘিরে ছিল। যখন তার সম্বিৎ ফিরলো তার পা দুটো অ্যান্নুবিসের পাথুরে মূর্তির পেটের কাছে।

তার ঘৃণিত চোখ দুটো এখন মূর্তির জীবন্ত জ্বলন্ত আতঙ্ক জাগানো চোখ দুটির মুখোমুখি।

সে অ্যান্নুবিসের চোখের দিকে তাকায়.......

দেখতে দেখতে নিহত শতাব্দীর অশুভ দেবতার শৃগাল মুখে জীবনের স্পন্দন জেগে ওঠে।

শিয়ালের মত বিমর্ষ মুখটা কুঁকড়ে যায়। সারা মুখে জীবনের বীভৎস শিহরন। শিয়ালের হিংস্র ঠোঁট দুটো খুলে যায়। দাঁত বার করা হিংস্র উল্লাসে মুখের ভেতরটা গুহার মতো। অ্যান্নুবিসের কুকুর দাঁতগুলো ভয়ঙ্কর লোভে ফাঁক হয়।

তারপর......

প্রাগৈতিহাসিক মিশরের প্রেত দেবতার ষ্ট্যাচু প্রকাণ্ড পাথুরে দুটো হাত বাড়িয়ে হেনরীকে জড়িয়ে ধরে। হিংস্র থাবার নখের মতো আঙ্গুলগুলো তার কেঁপে ওঠা গলাটা টিপে ধরেছে। ছুঁচোলো মুখটা সর্বগ্রাসী লোভে হাঁ হয়। পাথরের দাঁতগুলো শেয়ালের ধারালো দাঁতের মতো কাঁধে বিধে যায়।

এমনিভাবেই মরে যায় হেনরী।

কিন্তু মৃত্যুর আগে শেষ মুহূর্তে দেবতার চোখে যে ভয় দেখেছিল, তার পরে এই মৃত্যু তার কাছে আশীর্বাদের মত।

কিছুক্ষণ বাদে যেন শত শতাব্দীর ঘুম ভেঙে চোখ মেলে ক্লারা, সে অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখে তার পাশে শায়িত আছে হেনরীর মৃতদেহ।

হাত দিয়ে সে দেখে, ঠাণ্ডা। চোখ দুটি বিস্ফারিত।

সে প্রচণ্ড ভয়ে চীৎকার করতে যায়, তার গলা দিয়ে শব্দ ফোটে না।

মাথায় ওপর ড্রাগনের চোখ দুটি জ্বলে এবং একদিকে অ্যানুবিসের পাথর চোখে রক্তের দাগ লাগে।

ক্লারা কোনদিন জানবে না মৃত্যুর প্রাক-মুহূর্তে কি ভেবেছিল হেনরী।

অ্যানুবিসের চোখের দিকে তাকিয়ে সে হয়তো ভেবেছিল যে নিষ্ঠুরতম মৃত্যু মানুষকে মুক্তি দিয়ে যায়।

শুধু ক্লারা কেন, কেউ জানবে না।

জানবে শুধু একজন, যে এইমাত্র এক অলৌকিক পরিভ্রমণ সেরে ফিরে এল তার শোবার ঘরে।

সে লুসি। তার চোয়ালে টাটকা তাজা রক্তের দাগ। সে ছায়াময় শরীরে প্রবেশ করে হেনরীর ঘরে। তারপর নিস্পন্দ চোখে হেনরীর দিকে তাকায়। পরক্ষণে চোখ পড়ে তার বীভৎসা নগ্না ক্লারার দিকে।

সে হেসে ওঠে, হাসতে হাসতে এগিয়ে যায়·· ক্লারার চোখের সামনে চোদ্দ বছরের কিশোরী লুসি ক্রমশ পরিণত হচ্ছে কুড়ি ফুট উচ্চ শৃগাল দেবীতে। তার শীর্ণ দেহের অন্তরালে জেগে উঠছে রুক্ষ কাঠিন্যে ভরা পার্বত্য প্রতিমা। তার ভয়ার্ত মুখমণ্ডলে স্থাপিত হচ্ছে শয়তান শৃগালের অবয়ব, তার নিষ্পাপ চোখে ছায়া পড়ে রক্ত পিয়াসী জানোয়ারের।

বদলে যাচ্ছে লুসি, কেন না সে জানে তার প্রাণশক্তিতে চেতনা পেয়েছে নিহত শতাব্দীর অশরীরী দেবতা যে বেঁচে আছে তার আত্মার মধ্যে, বীভৎস এবং বিকৃত ভাবে।

এবার কি সে প্রতিশোধ নেবে না?

মাথা তুলে লুসি তাকাল অ্যানুবিসের জীবন্ত ষ্ট্যাচুর দিকে।

কি আশ্চর্য! সেই চোখে লেখা আছে হেনরীর যন্ত্রণাদীর্ণ দুটি চোখের প্রতিলিপি।

হেসে ওঠে লুসি।

ভয়চকিতা ক্লারার মনে সে হাসি মরু শৃগালের কান্না বলে মনে হয়।

যেন এখুনি তীক্ষ্ণ নখরে তার হৃৎপিণ্ড উপড়ে ফেলা হবে।

ছুটতে ছুটতেআসে ক্লারা, বীভৎস হাসির সঙ্গে ছুটে আসে লুসি।

শোনা যায় তার অপার্থিব কণ্ঠস্বর—আমি জানি ক্লারা, দশ বছর আগে ডিসেম্বরের এক উৎসবময় রাতে, এক নির্জন ডাকবাংলোতে কার কুটিল ষড়যন্ত্রে প্রাণ হারায় আমার অসুখী মা অ্যানিলিয়া।

কথার সঙ্গে সঙ্গে শীতল হাসির স্রোত আছড়ে পড়ে দেয়ালে। নিস্তব্ধ মধ্য রাত শুষে নেয় সেই হাসির তরঙ্গ। কিন্তু সেটা বাজতে থাকে ক্লারার চেতনায়।

—আমি জানি ক্লারা, কার নির্দেশে সে রাতে কিচেনের গ্যাস চেম্বারের সুইচ খোলা হয়েছিল। তাই একটু একটু করে প্রচণ্ড দাহ্য গ্যাস ছেয়ে ফেলেছিল বাতাস। দেশলাই কাঠিতে আগুন ধরানো মাত্র আমার মায়ের দেহ পরিণত হয়েছিল একতাল দগ্ধ মাংসপিণ্ডে। আমি জানি ক্লারা, আমাকে তুমি আর ফাঁকি দিতে পারবে না।

—না, বিশ্বাস কর, আমি চাইনি। সবই মৃত হেনরীর পরিকল্পনা।

ছুটতে ছুটতে হাঁফাতে হাঁফাতে দুর্বোধ্য শব্দ উচ্চারণ করে ক্লারা।

—হেনরী বলেছিল, আমাদের অলৌকিক জগতে অ্যানিলিয়া হল পার্থিব রমণী। তাই তাকে হত্যা না করলে কুহকিনী বিদ্যার গবেষণা সফল হবে না। তার নির্দেশে আমি তোমার মাকে হত্যা করেছিলাম।

এ যেন বধ্য ভূমিতে আনীত প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত আসামীর করুণ প্রাণ ভিক্ষা। কিন্তু গিলোটিন-কণ্ঠে হাসতে হাসতে ছুটন্ত লুসি

শেষ বারের মতো অলৌকিক আর্তনাদে বলে যায়—আমার কাছে তোমার কোন ক্ষমা নেই। তোমাকে মরতেই হবে।

হিমশীতল মধ্যরাতে করিডোর দিয়ে ছুটতে ছুটতে যায় দুটি ছায়ামূর্তি।

তারপর খোলা জানলাপথে অদৃশ্য হয়ে যায় লুসি আর ক্লারা

হাজার হাজার বছরের পুঞ্জীভূত অভিশাপকে গ্রহণ করে শয়তান শৃগালের চোখ জ্বলে ওঠে।

জীবন্ত ষ্ট্যাচু এবার মৃত হেনরীর দেহটিকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে। কঠিন পাথুরে হাতের নিষ্পেষণে হেনরীর দেহ থেকে নিংড়ে পরে রক্ত।

সে কি তখনো গোঙাতে থাকে?

তারপর তার গোটা দেহকে ভোজন করে পরিতৃপ্ত অ্যানুবিস রক্তাক্ত ঠোঁটে হেসে ওঠে।

অসহায় ড্রাগনের লাল চোখ শুধু জ্বলে, আর নেভে না।

## তৃষ্ণা যখন আদিম

মৃত্যু এসে কি কেড়ে নিতে পারে তপ্ত শরীরের কামনা? যে নারী মরেছে ব্যভিচারের যন্ত্রে, তার অতৃপ্ত আত্মার মধ্যে সর্বদা শোনা যায় শুধুই বিষাক্ত সহবাসের আলোড়ন।

অশরীরী হলেও সে নিজের যৌন-ক্ষুধাকে অবদমিত করতে পারে না।

যেমন ক্লারা। হোটেল পীককের নীল ছবির আসরে তার নীরব আত্মপ্রকাশ ঘটেছে।

হোটেল পীকক। ময়ূরের সাত রঙা পুচ্ছতে জ্বলে শুধু বাসনার

আলো। মাথা নীচু প্রশস্ত হল। এখানে প্রতি সন্ধ্যায় জমে ওঠে অশ্লীল ব্লু ফিল্মের গোপন প্রদর্শনী।

যারা এখানে এসে ভীড় করেছে তাদের অধিকাংশই হল বয়েসে তরুণ-তরুণী। বিকৃত ক্ষুধার কামনাতে ছুটে এসেছে হোটেল্স পীককের প্রায়-অন্ধকার এই আদিম ঘরে।

সাদা পর্দাতে প্রতিফলিত হচ্ছে মানুষের শৃঙ্গারের নানা ছবি, তার কামকলার হাজার উপকরণ।

দেখতে দেখতে দর্শকদের চেতনার মধ্যে ছোবল মারে আসঙ্গ লিপ্সা।

অনেকে সঙ্গিনীকে সঙ্গে দিয়ে হেঁটে গেল বন্ধ কেবিনে।

কিন্তু নির্বিকার হয়ে বসে আছে অগাসটো, বয়েস হয়েছে তার, ল্যাটিন আমেরিকার ব্যবসায়ী, এখানে এসেছে, ব্যবসার কাজে।

নিটোল চেহারা, পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি লম্বা, মজবুত দেহ, কোথাও মাংসের প্রাবল্য নেই। মাথায় চুল বেশ খানিকটা উঠে গিয়ে সৃষ্টি করেছে চওড়া টাক। ভোঁতা নাক আর পুরু কালচে ঠোঁট।

অগাসটোর জীবনে নারী বেশী আসেনি। আসলে সে রমণীদের পছন্দ করে না, তার অনেক ভালো লাগে সোনালী ডলারের উষ্ণ অনুরাগ। যে সময়টা মানুষ সঙ্গমে কাটায়, সেটাকে অর্থ উপার্জনের কাজে দিলে বেশী আনন্দ পাওয়া যায় এই হল তার অভিজ্ঞতা।

তবুও চোখের সামনে উদোম মেয়ে-পুরুষদের কামলীলা দেখতে দেখতে অগাসটো কি যেন তৃষ্ণা অনুভব করে।

সঙ্গে সঙ্গে তার প্রাণ শক্তিকে আচ্ছন্ন করে দেয় মধুর সুগন্ধ। সে ঘাড় কাত করে দেখল, ঠিক তার পেছনের চেয়ারে গা এলিয়ে বসে আছে এক নারী।

প্রথম দর্শনে থমকে গেল অগাসটো। রূপ যৌবনের এমন ছটা সহজে চোখে পড়ে না। মেয়েটির পরনে আঁটো মিনি স্কার্ট, অনেকখানি কাটা হওয়াতে বিশ্রীভাবে উন্মুক্ত বুকের আভাস, মাথায়

কাঁপানো চুল, মুখ চোখ নাক চিবুক চিক্কন। চোখে মড চশমা, কানে ঝুটা মুক্তোর দুল, ঠোঁটে ঘন কালো রঙ।

সব মিলিয়ে নিখুঁত ভোগের সামগ্রী! অগাসটো আরোও একবার তাকে দেখল। মেয়েটি স্তনবতী, পেট পাতলা, নিতম্ব ভারী, অন্তত তাই মনে হচ্ছে তার।

সে তাকিয়ে রইল, চোখের সামনে তখন সাদা পর্দাতে আলোড়ন তুলেছে একটি স্বর্ণকেশী ললনা, দেহের কোথাও এক চিলতে আবরণ নেই তার।

চোখের সামনে ছায়াসঙ্গিনী, পেছনে জীবন্ত রমণী। অগাসটো আর নিজেকে স্থির রাখতে পারল না, আলতো করে ডাকল—হাই কিড—

মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে তার কাঁধে আঙ্গুল ছোঁয়াল। স্পস্ট ইঙ্গিত, কিছুক্ষণ পরেই ওরা হল ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এল।

—চলো আমার কোয়ার্টারসে।

মেয়েটির কণ্ঠে কোন জড়তা নেই। শরীর গরবিনী মেয়েদের স্পষ্ট মনকে শ্রদ্ধা করে অগাসটো। ছেনালীপনা সে দু চোখে দেখতে পারে না।

কারে চড়ে ওরা পৌঁছে গেল শহরের নিরিবিলি অঞ্চল সেন্ট ম্যাজ স্কোয়ারে। এখানে রাতটা সত্যিই নিঝুম, অন্যান্য অঞ্চলের মত যৌবনা মুখরিতা নয়।

এলিভেটারে পা রেখে হালকা নিওনের আলোতে অচেনা মেয়েটিকে আরোও কাছ থেকে দেখবার সুযোগ পেল অগাসটো। পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চির মত উচ্চতা হবে মেয়েটির। সে প্রশ্ন করল সুন্দরী তোমার নাম জানতে পারি।

ঠোঁটের কোনে একটু হাসি এনে অজ্ঞাত মেয়েটি দাঁত চেপে বলে—গ্রেটা।

অগাসটোর নাকে প্রবেশ করেছে তার দেহ নিঃসৃত সুরভি।

অদ্ভুত একটা আমেজ, বন্য ঘামের গন্ধ মাখা দামী সুরভি। সে নিজেকে আর স্থির রাখতে পারল না। গ্রেটার কোমল স্তনে হাত রাখল।

এলিভেটারটা তার নির্দিষ্ট তলাতে এসে থমকে থেমেছে। গ্রেটা সামান্য শাসন করে বলে—তোমার এত খিদে কেন? চলো আমার বেডরুমে চলো।

নিজের হ্যাংলামিতে নিজেই লজ্জা পেল অগাসটো। সে তো এমন ছিল না, সীমাতে তার ছোট সংসার আছে। আছে স্ত্রী আর দুটি মেয়ে। স্ত্রীর মুখটা ভেসে ওঠে তার মনে। মোটা থলথলে চামড়ার একটা নির্বোধ।

তাকে আলিঙ্গন করে আর সুখ মেলে না। এমন কি রাতে যখন সে অসম্ভব জ্বালা নিয়ে উলঙ্গ হয়ে চোখের সামনে দাঁড়ায় তখনও তাকে সঙ্গম করতে বাসনা হয় না অগাসটোর।

কিন্তু এই গ্রেটা? এ যেন তার স্খলন ঘটাবে।

চাবি খুলে ঘরে প্রবেশ করল ওরা। ব্যালকনী পার হয়ে ড্রয়িং রুম, সাজানো গোছানো। সেটা পার হলে বেড রুম। ধবধবে সাদা চাদর নিষ্প্রাণ।

লাইটার জ্বেলে সিগারেট ধরাল গ্রেটা। ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল—কি ব্যাপার, অগাসটো, মধ্য রাতে একটা মেয়ের ডাকে চলে এলে? তোমায় ভয় করছে না?

ঠোঁটে জ্বলন্ত সিগারেট, বুক খোলা লাল মিনি স্কার্টের অন্তরাল হতে মুখ বাড়িয়ে দিয়েছে দুটি তেজী, তাজা, উন্নত স্তন। টপের দুটি বোতাম খোলা। কাঁচুলি পড়েনি গ্রেটা, সে জানে তার স্তন ঢাকবার মত ব্রেসিয়ার নেই পৃথিবীতে। তাছাড়া ঈশ্বরের সৃষ্টিকে বন্দিনী করার মধ্যে দুঃখ আছে।

অগাসটো দেখতে পেল দুটি পাহাড় আর মাঝখানের ঢালু উপত্যকা। সকালের শিশির ভেজা ওক-পাতার মত তাজা আর মসৃণ।

গ্রেটা মিষ্টি হেসে বলে,—আগে একটু মাতাল হয়ে নিই। মাতাল না হলে পুরুষের স্পর্শ আমার ভালো লাগে না।

গ্রেটা দমকে হাঁটছে, তার নিতম্বের আলোড়নকে চোখের লোভী তারার মধ্যে ধরে রেখে অগাসটো লম্বা সিগার ধরাল। শেষবারে কোন নারী সম্ভোগ করেছে সেটা তার মনে পড়ল না।

একটু বাদে তার মনে পড়ল, সেটা ছিল একটা কালো শ্রমিক, কফির ক্ষেতে কাজ করে। তার বোঁটকা দেহের গন্ধ নিতে নিতে অগাসটো পুরো দুটি রাত শুয়েছিল খামার বাড়ীতে।

গ্রেটার হাতে আইভরী ট্রেতে দুটি সিলভার গ্লাস। সে গুটা টেবিলে নামিয়ে রাখল। চোখের কোণে ফুটে ওঠে রক্ত-ছটা, সে আবেদনী কণ্ঠে বলে—টনিক-ওরস্টার। বলতে পারো এক্সলিয়ার অফ ইউথ। তার মানে যৌবনের সুধা।

তারপর হাসতে থাকে গ্রেটা, হাসতে হাসতে চোখে বিদ্যুৎ চমক সৃষ্টি করল। অগাসটোর ঠোঁটে মদের গ্লাস রেখে ফিস ফিস করে বলল—জানো তো আমার প্রতিটি মিনিটের দাম একশ ডলার। প্রতিরাতে আমি কত উপার্জন করি জানো? অঢেল টাকা, অজস্র অর্থ। তোমরা, বোকা পুরুষরা এত টাকা খরচ করো উলঙ্গ নারী দেহের জন্যে?

অগাসটো এক চুমুকে পুরো গ্লাসটা শেষ করে দিল। কিন্তু একি পান করল সে? ভোডকা-জীন-বুরবন-হুইস্কি থেকে শুরু করে সব রকম মদে তার স্বাদ অভ্যস্ত। কিন্তু গ্রেটার হাত থেকে নেওয়া ঐ গ্লাসে যা ছিল সেটার স্বাদ সে তো কোনদিন পায়নি।

এই তরল তার চেতনাকে কামনার জাড়ক রসে সিক্ত করে দিল। সমস্ত শরীর জুড়ে বাজতে থাকে দামামা—শরীর চাই, চাই উলঙ্গ দেহের আলিঙ্গন, চাই কোমল ঠোঁটের নিষ্পেষন, চাই দেহের শেষতম শক্তি-বিন্দুকে কাজে লাগিয়ে আনন্দ ঘন মুহূর্তের অনুসন্ধান।

অগাসটো তার সামনে দাঁড়ানো গ্রেটার প্রায়-নিলাজ দেহের দিকে তাকিয়ে অনুভব করে প্রচণ্ড লিপ্সা।

জড়ানো গলাতে বলে—আর একটু তরল, আরোও একবার, আমার বুকের মধ্যে জ্বলে যাচ্ছে—

গ্রেটার ঠোঁটে শয়তানীর হাসি, সে তুলে দিল মদের পাত্র।

অগাসটোর দেহ বিষ হয়ে গেল। চোখ বন্ধ হয়ে এসেছে তবুও ইন্দ্রিয়-লালসাতে জ্বলছে সে।

নিজেকে নিজের হাতে অনাবৃতা করে দিল গ্রেটা। পিঠের ফাঁস খুলে দুটি অনন্ত স্তনকে করল উদ্দাম। তারপর বিকিনি থেকে উন্মুক্ত করল নিম্ন দেশ, ঝকঝকে আলোটা নিভিয়ে দিতেই নেমে আসে হলুদ আলোর দংশন।

নিজের ক্ষুধাতুর নগ্ন দেহটা সামনে দাঁড় করিয়ে গ্রেটা আর একবার মদের পাত্র তুলে দিল মুখে। মদ দিয়ে মুখ সিক্ত করল, এটা তার অদ্ভুত সখ।

গ্রেটার উলঙ্গ দেহকে সিক্তা করেছে মদের ধারা। যেন জল-তলের রহস্যকন্যা সে। আয়নার সামনে দাঁড়াল হাত তুলে, নিজের অসম্ভব উগ্র দেহটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানা কৌনিক আবর্তনে দেখল গ্রেটা। কামানো দেহ, পিছল দেহ ঘিরে বাসনার স্বেদ বিন্দু টলটল করে।

অগাসটোর দেহটা স্থির করে শোয়ানো আছে কৌচে। গ্রেটা জিভ চাটল লালসাতে, তারপর ঝিলিক দেওয়া সাদা দাঁতে কুটিল হাসি এনে বাঁকা ভঙ্গিমাতে তুলে নিল তীক্ষ্ণ কাঁটা বসানো চাবুকটা।

অগাসটোকে উন্মুক্ত করে দিল। কালো না হলেও, রৌদ্র তপ্ত তামাটে দেহের নিখুঁত সমাহার। অগাসটোর বয়েস হয়েছে, তবুও আছে যৌবনের চাকচিক্য।

সোফাতে তার পাশে শুয়ে পড়ল গ্রেটা। এই বিবস্ত্র বিবশ সঙ্গমে সে প্রধান ভূমিকা নেবে। প্রতি রাতেই তার সন্ধানী চোখ এমন ভাবে খুঁজে আনে লোভী পুরুষদের।

প্রতি রাতেই সে মদের তরলে সিক্তা হয়ে পরিণত হয় কামিনী-ডাকিনীতে।

নিজের ক্ষুধা মেটাতে সে বেছে নেয় অগাসটোর মত সবল দেহের পুরুষদের। কেননা হেনরীর শীতল উদাসীনতা তাকে কষ্ট দিয়েছে।

হেনরীর নাম মনে পড়তেই সে চমকে গেল। আবেগের শেষতম মুহূর্তে তার সত্তার মধ্যে বজ্রপাতের মত ধ্বনিত হল হেনরীর ভৌতিক কণ্ঠস্বর।

'আমি বিশ্বাস করি, ( ঐ শীতল দেহের প্রেতসিদ্ধ পিশাচটা যেন মলিন চোখে পাথুরে দেবীর পাদমূলে বসে করুণ বিলাপ করছে ) আমি আত্মার অবিনশ্বরতায় বিশ্বাসী। আমি জানি তুমি একদিন মরবে ক্লারা। তোমার কামনার সঙ্গে বাসনা-তাড়িত অতৃপ্ত আত্মা অশরীরী হয়ে বুকফাটা ক্রন্দনে ভরিয়ে তুলবে শীতল রাত্রির বাতাস। তোমার মুক্তি হবে না, তোমার অনন্ত যন্ত্রণার শেষ হবে না।'

বিশ্বাস করি না, তোমার প্রেত তত্ত্বের কঠিন অনুশাসনকে আমি বিশ্বাস করি না। আমি জানি শরীরের মধ্যে মুক্তি আছে। মৈথুন যেন আত্মার শান্তি। সহবাসের চরম মুহূর্তে নেমে আসে শীতল বারিধারা। আমাকে তোমাদের প্রশস্ত বুকের মধ্যে, তোমাদের প্রবল তৃষ্ণার মধ্যে মুক্ত করো।

গ্রেটা কাঁদতে থাকে, কাঁদতে কাঁদতে অগাসটোর সঙ্গে নিজের দেহটাকে লেপটে ধরে।

তারপর অনেকক্ষণ কেটে গেলে সাইপ্রাস অরণ্য থেকে উঠে আসে একটা ভীত সন্ত্রস্ত হায়েনা। সেটা এসে অনুপ্রবেশ করে গ্রেটার আত্মার মধ্যে।

লক্‌লক্‌ করে জিভ তার, সে তীক্ষ্ণ কাঁটা দেওয়া চাবুকটা চালিয়ে দেয় উলঙ্গ অগাসটোর দেহে।

রক্ত···প্রথমে বিন্দু বিন্দু···তারপর অঝোরে ঝরতে থাকে....

রক্ত যেন ডাক দেয় অতৃপ্ত আত্মাকে। তৃষ্ণাতে কাতর হয়ে

অনন্ত বছর ধরে বসে থাকা গ্রেটা জিভ নামিয়ে আনে। লোভীর মত সে এখন লেহন করছে উলঙ্গ কালো পুরুষ অগাসটোর গোটা দেহ।

নোনা রক্তের স্বাদ তাকে পরিতৃপ্তি দিয়েছে। ঘামের পরশ দিয়েছে শান্তি।

এমনভাবে সারারাত ধরে সে নিঃশেষে পান করে উষ্ণ রক্ত।

অবশেষে রাত ফুরিয়ে আসে। এবার তাকে ফিরতে হবে, সে হাওয়ার মধ্যে ভর দিয়ে ভেসে যায়।

তখনই হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল গ্রেটার। কমারশিয়াল ফার্মের সুন্দরী রিশেপশনিস্ট মিস গ্রেটা হারালো। তেইশ বসন্তের রূপবতী গ্রেটা অবাক হয়ে দেখল!

গাল তার লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছে। এ কি দেখছে গ্রেটা? একেবারে নগ্না হয়ে শুয়ে আছে সে। শুধু কি তাই? তার পাশে মেঝেতে শায়িত এক পুরুষের দেহ। প্রাণ আছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না।

গ্রেটা উঠে বসতে গেল, পারল না। অসম্ভব যন্ত্রণা হচ্ছে তার মাথার মধ্যে। হাত-পা অদ্ভুতভাবে বেঁকে যাচ্ছে। ঘরের তাপমাত্রা অনেক কমে গেছে। হিমাঙ্কের নীচে পৌঁছে গেছে। প্রচণ্ড শৈত্যের নিরবিচ্ছিন্ন প্রবাহ এসে গ্রাস করছে তার অনুভূতিকে।

কোন রকমে উঠে দাঁড়াল গ্রেটা। বেডরুম জুড়ে শুরু হয়েছে ভৌতিক আত্মার দাপাদাপি। আসবাবপত্র নড়ে উঠছে, মাথাটা ঘুরতে শুরু করেছে, বন্ধ রেডিওটা প্রচণ্ড জোরে বাজছে।

এমন অবিশ্বাস্য ঘটনার কোন মানে খুঁজে পাচ্ছে না গ্রেটা।

সে দেহে একটা তোয়ালে জড়িয়ে নিল। কৌচে এলিয়ে দিল তার ভীতা দেহটা, তারপর কপাল চেপে ভাবতে বসল গতকালের কথা।

বিকেল পাঁচটাতে অফিস ছুটি হলে সে এসেছিল ব্যারনস কাউন্টারে।

ওখানে তার বন্ধু ক্লাইভের আসার কথা ছিল। আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করার পরে অধৈর্য হয়ে উঠেছিল গ্রেটা!

ক্লাইভ আসেনি, কিন্তু কালকের দৈনিক পত্রের খবরটা পড়ে শীতল অনুভবের স্পর্শে কেঁপে উঠেছিল তার দেহ। ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার ক্লাইভের দেহটা হাইটেনশন তারে ঝুলছে, সিটি নিউইয়র্কের উপকণ্ঠে।

তার মানে পুড়ে গেছে ক্লাইভ। আশ্চর্য লাগে ভাবতে, আগের দিন রাতে তার সঙ্গে কথা হয়েছে প্রাণ চঞ্চলতায় ভরা ঐ বেপরোয়া যুবকের। গ্রেটার হাতে ক্রিসেনথেমামের গোছা তুলে দিয়ে হাত নেড়ে দুঃখ করে ক্লাইভ বলেছিল—I have no desert to live, I want to die…

তারপর চকিতে গ্রেটার কপালে এঁকেছিল তার চুমু। গ্রেটা যেন এখনো সেটার স্পর্শকে ধরে রেখেছে।

জীবন আর মৃত্যুর মধ্যে শায়িত আছে অদৃশ্য মহাকাল। তার এক চোখে জীবন-আনন্দ, অন্য চোখে মৃত্যু-চুম্বন।

গ্রেটার চোখে জল এসেছিল, সে প্রবল সংযমে নিজেকে স্থির রেখে ভাবছিল যে ক্লাইভকে একবার দেখে আসবে কি না।

যে ছেলেটির উল্লাস ভরা কণ্ঠের কাকলিতে ভরে যেতো বাতাস তার নিস্পন্দ দেহটি দেখবার মত সাহস তার ছিল না। সে অনেকক্ষণ একা বসেছিল ব্যারনসে। ঐ কোণের টেবিলে তারা কতদিন নিভৃতে বসেছে, কত রাত শুনেছে হুলা-হুলা ফোক সঙ্গীত।

হঠাৎ কে যেন তার আঙুলে আঙুল ছোঁয়াল। গ্রেটা অবাক হয়ে তাকাল, দেখল, এক তরুণী। তার অজানা। মেয়েটির চোখে কেমন অস্থিরতা। সে পরিচিত ভঙ্গিতে বলল—আমি তোমার দুঃখের উপশম করতে পারবো। তুমি আমার সঙ্গে এসো।

গ্রেটা আচ্ছন্নের মত মেয়েটিকে অনুসরণ করে হাজির হল পাতাল পথে। অন্ধের মত সেই ছায়াচারিনীর সঙ্গে গ্রেটা অবশেষে এসে

পৌছল হোটেলে পীককে। এই পরিবেশ তার অজানা নয়, কিন্তু জঘন্য নোংরামির মধ্যে নিজেকে জড়াতে চায়নি।

তনুবাহিত প্রেতায়িত আত্মার চেতনা নিয়ে ছায়া-রমণী ক্লারা এবার রূপ নিল গ্রেটার দেহে। আজকের রাতে সে গ্রেটাকে নিজের অপূর্ণ অভিলাষের রঙে রঙীন করবে। তার অসম্পূর্ণ ইচ্ছাকে পূরণ করবে ঐ অনুগতা নারী।

…এ আমার কি হল ?

গ্রেটা যেন নিজেকে প্রশ্ন করছে। তার কোষের মধ্যে আলোড়িত হচ্ছে সঙ্গম-তৃপ্ত কামনা, কেন ? সে তো উদ্দাম যৌনাচারের বাহিকা ছিল না। সে বিশ্বাস করতো প্রেম। প্রেম তড়িৎ-দগ্ধ হয়ে শূন্যে বিলীয়মান। অন্ধকার হলে বসে ব্লু-ফিল্ম দেখতে দেখতে সমস্ত শরীরের মধ্যে সে অনুভব করল জ্বালা। স্ত্রী-অঙ্গে অদ্ভুত আবেগ। শরীর চাই, চাই বলিষ্ঠ নিষ্পেষণ। অগাসটোকে দেখে চোখের তারাতে সে এনেছিল লাস্য।

তারপর…? ছবির মতো স্মৃতিরা ভাসছে মনের আয়নাতে। হাত ধরে নিষিদ্ধ উত্তেজনার স্বাদ গ্রহণ করা, নিজেকে অনাবৃতা করে মোহিনী তরলে স্বাদ মেটানো, তীক্ষ্ণ কাঁটার চাবুক হাতে নির্লজ্জ আস্ফালন, রক্ত-ঘাম-স্খলনকে বীভৎস জিভে লেহন, সব ঘটনা তার মনে পড়ছে।

অনুশোচনাতে হাঁটু মুড়ে বসল গ্রেটা। শায়িত অগাসটোর নিস্পন্দ দেহের সামনে বসল গ্রেটা।

ক্লারা চলে গেছে, ফিরেছে গ্রেটা। তার অন্তরে এখন মৃত ক্লাইভের জন্যে নিথর শোক আর গত রাতের অভাবনীয় ঘটনার জন্যে বিলাপ। সে বিড় বিড় করে বলতে থাকে—আমাকে ক্ষমা করো। আমি প্রভাবিত হয়েছিলাম। আমার কোন দোষ নেই।

তারপরে আবার বিকট চেতনা এসে গ্রাস করল তাকে। সে ঘাড় বেঁকাল, ঘাড়টা পুরো ঘুরে গেল। চোখের থেকে ঠিকরে গেছে মণি, রক্তস্রাব শুরু হয়েছে তার !

ঘরের মধ্যে সশব্দে আছড়ে পড়ছে আসবাব। হঠাৎ চোখের সামনে দেখতে পেল মৃত ক্লাইভের করুণ পরিণতি।

কঙ্কালে জর্জরিত হচ্ছে সুঠামদেহী পুরুষ। তার দেহের কিছুটা এখনো সত্তাকে ধরে রেখেছে, বাকীটা শুধু হাড়ে বাঁধানো। অবিশ্বাস্য ভৌতিক ঘটনা!

ভয়ে শিহরণে বিন্দু বিন্দু ঘাম ঝরছে গ্রেটার কপালে!

হৃদযন্ত্রটা শব্দ করে লাফাচ্ছে। নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে তার। মনে হচ্ছে দম যেন বন্ধ হবে।

চোখের সামনে গোটা দেহটা পরিণত হল কঙ্কালে। কঙ্কাল অথচ ধমনীতে বাহিত লোহিত রক্তপ্রবাহ।

কেমন করে সম্ভব? একি কল্পনা? কিন্তু নিজের এই শারীরীক বিপর্যয়ের জবাব দেবে কি করে?

রক্ত পড়ছে বিষাক্ত ঘা দিয়ে, সারা দেহে দ্রুত ছড়িয়ে যাচ্ছে ঐ দুরারোগ্য ক্ষত। দগদগে ঘাতে ভর্তি পুঁজ, গ্রেটা ভয়ে আঁৎকে ওঠে।

কালো পাখীর বিরাট ডানা এসে ঢেকে দিয়েছে আকাশ।

গ্রেটার অসহ্য যন্ত্রণা ক্রমে বাড়তেই থাকে।

অগাসটো নিদ্রার মধ্যে স্বপ্ন দেখে এক উলঙ্গা নারীর। তার দুটি স্তন যেন বুলেটের মত আঘাত করবে, উরু-সন্ধিতে জমা আছে নীলবিষ।

ছুটতে থাকে, পারে না, হাজার ফুট উঁচু পাহাড়ের চূড়া থেকে পা পিছলে সে পড়ে গেল মৃত্যু গহ্বরে।

যেখানে সভ্যতার বয়েসী অন্ধকার বোবা চীৎকারে বলছে—এখানে তোমার তৃষিত আত্মার শান্তি, এখানে এসো।

—আমি বিশ্বাস করি, মানুষ মরে যায়, আত্মা মরে না। পার্থিব জীবনে বাসনা অতৃপ্ত থাকলে সেই আত্মাকে আবার জন্মগ্রহণ করতে হয়।

প্রোফেসর হেনরী টার্নার গম্ভীর মুখে বলছে। না, তার নাম হেনরী নয়, সে হয়েছে রিচার্ড অ্যামুনসন। প্রবীন চেহারার এক স্থির প্রত্যয়ে ভরা বুদ্ধিজীবী।

যদিও অনেকে তাকে মনে করে আরোপিত প্রেতাত্মার প্রতীক। তার এই স্কুলে শেখানো হয় প্রেত তত্বের নানা শিক্ষা। শুধু বইয়ের পাতার মধ্যে আবদ্ধ নেই ট্রেনিং-এর পাশাপাশি আছে বাস্তব পরীক্ষার কেন্দ্র।

স্টেজের ওপর মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে প্রোফেসর রিচার্ড অ্যামুনসন। কালো আলখাল্লা তার দেহটা প্রায় ঢেকেছে, চোখে পুরু লেনসের চশমা, চুলেরা অবিন্যস্ত। হাতে ধরা হাড়ের লাঠি। সামনের টেবিলে মৃত মানুষের খুলি। পেছনের কালো পর্দা মাঝে মাঝে ফুলে ফুলে উঠছে।

পারস্য দেশীয় সুগন্ধি ধূপের ধোঁয়াতে ভরে গেছে আবদ্ধ ঘরের বাতাস।

তিনটি ছায়ারমণী দাঁড়িয়ে আছে ঘরের এক কোনে, তারা নিশ্চল পাথর-প্রতিমার মত শুধু দাঁড়িয়ে আছে। তাদের দেহে আবরণ নেই, ঘন কালো রঙে বীভৎস তিনটি মূর্তি, শুধু টকটকে লাল দুটি ঠোঁট হতে গড়িয়ে পড়ছে উদগ্র বাসনার লাল রক্ত।

প্রোফেসরের সম্মোহিত ভঙ্গিমার সামনে সমবেত শ্রোতারা স্থির চিত্তে বসে আছে। সব রকমের উৎসাহী মানুষ এসেছে এখানে। রিচার্ডের কাজে তাদের প্রবল জিজ্ঞাসা।

রিচার্ড কি নররূপী শয়তান? মানুষের পবিত্র আত্মাকে প্রেতায়িত করে দেয়? নাকি সে হল ঈশ্বরের প্রতিবেশী? মানুষের মনে লুকিয়ে থাকা গুপ্ত অহংকারের উন্মেষ ঘটায়?

এ নিয়ে শ্রোতাদের মনে দ্বিধার অন্ত নেই।

রিচার্ডের নির্দেশে আলো নিভে গেল। ভেসে এল আফ্রিকার গহন অরণ্যে ঘুরে বেড়ানো কালো চিতার হাহাকার।

জলীয় ভয়ার্ত অনুভূতি এসে গ্রাস করছে দর্শকদের মনোভাব। প্রোফেসর রিচার্ড হাড়-দণ্ড দুটি তুলে নিয়ে সম্মোহনের বিচিত্র ভঙ্গিমা করল।

পেছনে হঠাৎ এসে দাঁড়ায় একটি বিবর্ণ কঙ্কাল, তার দুটি চোখে জ্বলছে লাল আগুন। কঙ্কালটি সচল হয়েছে, স্টেজ ছেড়ে এগিয়ে চলেছে দর্শকদের মধ্যে।

—এই কঙ্কালটি হল মিস মিচেলের, যে মেয়েটি মাত্র ষোলো বছর বয়েসে এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যায়। প্রেমের ব্যর্থতা তাকে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করেছিল। কলোরাডো নদীতে ডুবে মারা যায় মিস মিচেল। তার দেহটা দশদিন বাদে পচা গলা অবস্থায় আবিষ্কৃত হয়। হাঙরের দল টুকরো টুকরো করে খেয়েছিল মাংস। তারপর ঐ বীভৎস মৃত দেহটি আটচল্লিশ দিন ডুবিয়ে রাখা হয় অ্যালকোহলের চৌবাচ্চায়।

মিস মিচেলের দেহকে সমাধি দেওয়া হয় নি। সে তাই আজও ঘুরে বেড়ায় বাতাসের মধ্যে।

দর্শকরা ভয়ে শিউরে উঠছে। মিস মিচেলের কঙ্কাল এসে দাঁড়িয়েছে তাদের সামনে।

প্রোফেসর বলতে শুরু করে—এবার আমি প্রাণের পুনঃপ্রতিষ্ঠার সাহায্যে এর দেহে আরোপ করব হারানো সত্তা। তার আগে দেখুন মৃতা মিচেলকে।

প্রোফেসরের কথা শেষ হল না, হলের মধ্যে শোনা গেল সমবেত

একবার চোখ মেলে ছাখ। যারা ঘুমিয়ে আছিস কবর তলে, মরে গেছিস, দেহ যাদের পচা-গলা লাশ…

বুঝি সেই প্রাণ আকুল করা আহ্বান শুনে ঘুম ভাঙে মৃতার্ত দেহের। পৃথিবীর যেখানে যত অশরীরী ভাসমান বাতাসে তারা সম্বিত ফিরে পেল।

তাদের চীৎকারের মধ্যে কিছুই শোনা গেল না। শুধু মনে হল তারা যেন পার্থিব প্রাণে ফিরে আসতে কষ্ট পাচ্ছে। দম নিতে পারছে না, হাঁফ ধরছে।

সমুদ্রে নিমজ্জিত মৃত্যমুখে বিলীন মানুষের মত তারা শেষ ভৌতিক আর্তনাদে বলছে—দোহাই তোমাকে, আমাদের আর জীবনের লোভ দেখিও না। এখানে অনেক ভালো আছি।

জীবন মানেই সংঘাত, অকারণ প্রতিযোগিতা আর হিংস্র ব্যবহার।

…আমাদের মৃত দেশে থাকতে দাও।

প্রোফেসর রিচার্ড যাদু দণ্ড তুলে নিল। মিচেলের রক্ত-মাংসের সজীব তাজা লোভাতুর শরীরে আবার নেমে এসেছে ভয়াল মৃত্যুর ছায়া, সে ক্রমশঃ পরিণত হচ্ছে জীবন্ত কঙ্কালে।

তার চোখের তারা গেল শূন্যে হারিয়ে, সেখানে ফুটেছে বিহ্বল গহ্বর, তার হাতের চামড়া কুঁচকে গেল, স্তন দুটি হল রক্তাক্ত। তার তলদেশে জমেছে পুঁজ, বিষাক্ত দগদগে ঘা আচ্ছন্ন করেছে মুখমণ্ডল। চিকন-প্রভা চুল হল রুক্ষ।

সে ফিরে পেল তার কঙ্কাল। যেখানে কাটবে তার অবরুদ্ধ আত্মার অন্তহীন প্রহর। তার মধ্যে শরীরী লাবণ্য যেন শেষ রাতের দুঃস্বপ্ন।

যারা লালসা-ক্ষুব্ধ হয়েছিল তা আবার সন্ত্রস্ত হল। যে সব নারী সমকামের বিকৃত আনন্দ লাভে আলিঙ্গন করেছিল সহেলীর কোমল তনু, তারা থমকে গেল।

যেসব পুরুষ কামুক হয়ে অস্থির যাতনাতে ছটফট করছিল তারা এক লহমাতে শান্ত হল।

এবং যারা উন্মুক্ত হলে পরস্পরের সঙ্গে দেহ সহবাসে মেতেছিল, অনন্ত লজ্জা এসে চেপে দিল তাদের।

মিচেলের কঙ্কাল ফিরে গেল কাঁচের কফিনে, শায়িতা রইল একা, অ্যালকোহলে ভাসন্ত রইল।

প্রোফেসর আবার মাইকের সামনে বলে—মিচেলের মত আমাদের অতৃপ্ত আত্মাও ক্ষণকালের জন্যে ফিরে আসে। আত্মা যে সূক্ষ্মশরীর, যেন একটি জলবিন্দু। কখনো সে লুকিয়ে থাকে অদৃশ্য বাষ্পের মধ্যে, কখনো থাকে মেঘের আড়ালে। কখনো হিমবাহ অথবা কুয়াশার মধ্যে রূপান্তরিত হয়।

…আত্মার মধ্যে থাকে জীবিতকালের চিন্তা অথবা বাসনার রেশ। যে অপূর্ণ আশা নিয়ে আমরা মরে যাই, আত্মার মধ্যে সেই অসম্পূর্ণ আকাঙ্ক্ষা মিশে থাকে। উপযুক্ত বাহকের সন্ধান পেলে সেটা তার আরব্ধ কাজ শেষ করতে পারে।

হলের মধ্যে বিরাজিত মৃত্যু-শীতল নীরবতা। প্রোফেসর কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলে—আমার এই বক্তব্যের সমর্থনে আমি পরীক্ষা করে দেখাচ্ছি যে কিভাবে অতৃপ্ত আত্মা ফিরে আসে।

নতুন কোন এক শিহরিত ছমছমে চেতনার আশঙ্কায় থর থর করে কাঁপছে দর্শকদের মন। তারা প্রবল প্রচেষ্টায় তাদের ভীতি দূর করছে।

—আমার এই কাজে সাহায্য করতে পারে একজন চোদ্দ বছরের মেয়ে। যে হবে মিডিয়াম, আমি তাকে মাধ্যম করে ডাকবো আমার মৃতা কন্যা লুসিকে। ঐ মিডিয়ম হবে শীর্ণা, রোগাক্রান্তা এবং সরল স্বভাবের। আপনাদের মধ্যে যদি এমন কেউ থাকেন তাহলে দয়া করে এগিয়ে আসুন।

প্রোফেসরের বাচন ভঙ্গিতে মেশানো আছে গোপন যাদু, তার কুহক-ডাককে অস্বীকার করা গেল না।

একটি মেয়ে পা ফেলে ফেলে এগিয়ে আসছে। রোগা, পাতলা দেহ তার। পরনে সাদা হাঁটু ঝুল ফ্রক, মাথার চুলে চিরুনী বাঁধা, আছে দুটি লাল রিবন।

মেয়েটি সোজা হয়ে তাকাল প্রোফেসরের দিকে। রিচার্ড তাকে বসাল লোহার চেয়ারে। কালো ছায়ারমণীরা এসে হাত-পা বেঁধে দিল সরু তার দিয়ে।

মেয়েটির চোখে বাঁধা হল কালো সিল্কের রুমাল। ঘনীভূত আলো পড়েছে তার নিস্পন্দ দেহের ওপর। এছাড়া হলে একটিও আলো নেই।

প্রোফেসর উঠে এসে মেয়েটির কপালের কেন্দ্রে আঙুল ছোঁয়াল। তারপর কি অদ্ভুত মন্ত্র উচ্চারণ করতে থাকে। মেয়েটি প্রথমে নিশ্চল হয়ে বসে আছে।

কিছুক্ষণ বাদে সে চোখ বাঁধা অবস্থায় চলতে শুরু করে।

চোখ বন্ধ থাকলেও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সে, বাধাহীনা হয়ে এগিয়ে চলেছে সামনের দিকে।

রিচার্ড তার মুখ মেয়েটির কানের কাছে এনে বলতে থাকে—শোন লুসি, তুই কেমন আছিস? আমার কথা মনে থাকে না তোর? আয়, একবার তুই শরীরের খাঁচার মধ্যে চলে আয়। লুসি, তোকে আমি কতদিন দেখিনি।

মেয়েটি হাত খিঁচিয়ে চলেছে, ঘাড় বেঁকাচ্ছে, মুখ দিয়ে লালা ঝরছে তার। সেই শীর্ণা মেয়েটি প্রবলভাবে মুক্ত হবার চেষ্টা করছে তার বন্ধন-অবস্থা থেকে।

সে নিজেকে বাধা-মুক্ত করে ফেলল। তারপর তার বীভৎস চোখে জ্বলে ওঠে প্রতিশোধের আগুন। দপদপ করে জ্বলছে ক্ষুধার্ত কোটর। মেয়েটি যেন লুসির আত্মাতে ফিরে চলেছে।

লুসি, লুসি, তুই ফিরে আয়। আয়, শরীরী চেতনাতে, তোর মুখে আবার কথা ফুটুক, চোখের কোণে নেমে আসুক অশ্রু। তুই

আবার আগের মত পিয়ানোর সামনে বসে কাঁপা আঙ্গুলে বাজাতে থাক স্লিপী আইজের স্থর। আমরা……

রিচার্ডের কথায় মধ্যে শোনা গেল বহু দূরের ওপার থেকে ভেসে আসা গলাতে অব্যক্ত বেদনা মন্দ্রিত স্বর, তাতে ঝরছে আজন্ম-ঘৃণা।

…তোমাকে আমি বিশ্বাস করি না বাবা, তোমাকে আমি একটুও বিশ্বাস করি না। তোমরা আমাকে তিলে তিলে মেরে ফেলেছিলে। অসহ্য যন্ত্রণা দিয়েছো, অশেষ তৃষ্ণা নিয়ে আমি একফোঁটা জল পান করতে না পেরে মরেছি। আমাকে আর ডেকো না, যদি আমি আবার ফিরে আসি, তাহলে তোমার অন্তিম ঘনিয়ে আসবে। পারবে তুমি সহ্য করতে বিনষ্ট লুসির আক্রোশ?

পারবো, পারবো, আমি সহ্য করবো তোর প্রতিশোধের তপ্ত আভা। তুই ফিরে আয়……

হলের মধ্যে যেন বজ্রপাত ঘটে গেল। আগ্নেয়গিরি থেকে উদ্ভূত লাভা স্রোতে ভেসে গেল। উপস্থিত শ্রোতাদের চেতনা।

সূক্ষ্ম কণিকা বাহিত আত্মার মুখোস পরে লুসি সামনে এসে দাঁড়ায়।

শীর্ণা মেয়েটি পরিবর্তিত হয়েছে লুসির অভিশপ্ত আত্মায়, কঙ্কালের দেহে মানবী আবেদন। শুধু মুখটি রক্ত-মাংসের, গোটা দেহ খাঁচা শুকনো হাড়ের।

চোখে চোখে তাকাল লুসি আর হেনরী। দু'জনের চোখেই ঝরছে আদিম ঘৃণা, দুটি ডাইনোসোর যেন পুঞ্জীভূত অগ্নি-দৃষ্টিতে ধ্বংস করে দেবে পরস্পরকে

তারপর হলের নীরবতার মধ্যে অর্কিড দেহের পত্রালী কাঁপে। লুসির ছোট্ট দেহটা ক্রমে বাড়তে বাড়তে বিরাট আকার ধারণ করল। স্টেজের মাথা ছুঁয়েছে তার চুল।

তিনটি কালো ছায়ারমণী অদৃশ্য হয়ে গেল ভয়েতে। হেনরী

পালাতে চাইছে কিন্তু পারছে না। তার পা দুটি আটকে আছে মঞ্চের কাঠের পাটাতনে।

সে প্রাণ ভিক্ষা চাইছে, নতজানু হয়ে বসেছে লুসির পায়ের সামনে। বলছে, আমার ভুল হয়েছিল, আমি তোকে মেরে ফেলেছি, আমাকে ক্ষমা কর।

হো হো করে হেসে ওঠে লুসি। হাসির দমকে গর্বিতার ভঙ্গিমায় বলে—ক্ষমা? তোমাকে? তোমাকে আমি ঘেন্না করি। জানো দগ্ধ-যন্ত্রণা কি ভয়ঙ্কর? আমার নিঃসঙ্গা মা কতখানি জ্বালা সহ্য করে মরেছিল? তোমাকেও আমি ঐ ভাবে হত্যা করবো।

—নাহ্, না, না, লুসি, শোন, তুই আমার মেয়ে। আমার প্রাণ তুই ফিরিয়ে দে। অ্যানুবিসের পাথুরে মূর্তিতে আমি দেখেছি আমার বিদীর্ণ আঁখি। হাজার হাজার বছর আগের অতৃপ্ত ভ্রূণ এসে আঁকড়ে ধরছে আমার ক্লান্ত শরীরকে। আমার চেতনার জটিলতার মধ্যে দুরন্ত শৃগালের রক্ত-লোলুপ বীভৎস জিভ লক লক করেছে······

লুসির ছায়া-হাত পর্দাতে কাঁপছে। লুসি এগিয়ে এসে কঠিন বজ্র-বাঁধনে জড়িয়ে ধরল হেনরীর গলা। তারপর আধিভৌতিক চীৎকারে ভয়াল প্রতিশোধের প্লাবন তুলে বলে—দেখো, বাবা, তোমার দেহ কেমন পুড়ছে। দাউ দাউ জ্বালা আগুনে তুমি কালো অঙ্গার হয়ে যাচ্ছো। হা-হা-হা···

লুসির হাসির দমকে ভেঙে যায় হল। একটা বাদুড় কালো ডানা মেলে এগিয়ে আসে।

—মা, দেখো, আমার দুহাতে রক্ত, দেখো, আমি বাবাকে হত্যা করেছি।

কাতর কণ্ঠে বলছে লুসি, তার দুটি কোমল করতলে নিহত পিশাচের কালো রক্ত। সে তবু কেন মুখ নীচু করে কাঁদছে? একি তার আজন্ম-বাহিত সংস্কার?

অ্যানিলিয়া চোখ মেলে তাকাল। বিবর্ণ পোড়া একটা কালো মূর্তি। চেতনাহীনা হলেও বিষাদমগ্না নয়, সে মলিন হেসে বলে—এমনভাবে তুই কি প্রতিশোধ নিতে পেরেছিস ?

—মা, কি বলছো তুমি? ঐ পিশাচটা যে তোমাকে কত অত্যাচার করেছে, তোমাকে জীবন্ত পুড়িয়ে মেরেছে।

—আর বলিস না লুসি, বললে কি সে দিনগুলো ফিরে আসবে ?

কুয়াশার চাদরে ঢাকা তার দুঃখী মায়ের মুখ। সে আলতো স্বরে বলল—কিন্তু দু হাতে বাবার রক্ত মেখে আমি যে প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলাম।

—প্রতিশোধ ?

শেষ সূর্যের আলোছায়ায় দুটি চোখ যেন বিবর্ণ আতস-কাঁচে ঠিকরে পরা মোম-আলো। যখন অ্যানিলিয়া তাকায়, মনে হয়, তার সমস্ত চেতনা যেন দেখছে। যখন সে কথা বলে, মনে হয়, শুধু দুটি ঠোঁট নয়, বাঙ্ময় তার গোটা দেহ।

—আমরা শরীর হারানো আত্মা, আমাদের কাছে প্রতিশোধের কোন দাম নেই।

—কি বলছো মা, আমি যে নিজের হাতে গলা টিপে মেরেছি বাবা হেনরীকে। আমি যে—

বলতে পারে না লুসি। অনুশোচনা অথবা অসহায় আর্তিতে ভরে গেছে তার মন। সে কোন রকমে বলে—তাহলে আমি কি ভুল করেছি ?

মেয়ের রুপোলী চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে অ্যানিলিয়া কোমল গলাতে বলে—ভুল ? না-রে, তোর কি ভুল হতে পারে ?

তারপর সে মুছিয়ে দিল করতলের রক্ত। বলল—আয় তোকে একটু ঘুম পাড়াই।

অ্যানিলিয়ার কোলে শোয়ানো আছে লুসি।

এই মুহূর্তটি যদি অনন্ত হয়ে থাকতো? অ্যানিলিয়া ধীরে ধীরে লুসির মাথায় হাত বুলিয়ে চলেছে। সে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে অদূরে।

এখানে বাতাস নেই, আকাশ নেই, আছে শুধু আকৃতি হারা ধোঁয়ার বিবর্ণ ধূসরতা। এখানে অস্তিত্ব নেই, আছে আহুতি অন্বেষণ।

অ্যানিলিয়া ভাবতে থাকে···তার পার্থিব জীবনের অপমানের কথা। কোথায় ছিল সে? কার কন্যা হয়ে?

ইউক্যালিপটাস গাছের ছায়া কাঁপে। দূর সন্ধ্যার বাতাসে ভাসতো স্মৃতি। ভাসছে মুখ, কার মুখ? সে কি জানে?

ও দুটি চোখে ঝরছে সহানুভূতি, সে কি তার খবর রাখে?

হেনরী তাকে কি দিয়েছে?

প্রাত্যহিক শরীর যন্ত্রণা ছাড়া আর কি তুলে দিয়েছে তাকে? কোন মর্যাদা অথবা সম্মান?

মিলনের প্রথম রাত থেকেই সে ব্যস্ত থাকতো প্রেত অন্বেষণে। রাতের পর রাত ভালোবাসার জন্যে অধীর হয়ে অপেক্ষা করেছে অ্যানিলিয়া, আর হেনরী ব্যস্ত থেকেছে প্রেত তত্ত্বের গবেষণাতে।

শুধু কি তাই? লুসির জন্ম হয়েছে তাদের অবৈধ মিলনে। হেনরী চেয়েছিল জন্ম মুহূর্ত থেকে লুসিকে প্রেতাত্মায় পরিণত করতে। এই জন্যে অ্যানিলিয়ার অবর্তমানে সে নিয়মিত রক্ত শোষণ করত লুসির।

একদিন ঐ ভয়াবহ দৃশ্যটা চোখের সামনে দেখতে পেয়ে চীৎকার করে ওঠে অ্যানিলিয়া। হেনরীর হাতে সিরিঞ্জ, তার সাদা অ্যাপ্রনে

রক্তের ছিটে দাগ, সে লোভী চোখে চেয়ে আছে ন' মাসের রুগ্ন শিশু লুসির দিকে।

—হেনরী!

শব্দটা অভাবিত চমক সৃষ্টি করল হেনরীর কানে। সে একটু দেখল, তারপর তাচ্ছিল্য এনে বলল—তুমি এখন এখানে কেন? যাও ভেতরে যাও।

বাধা দিল অ্যানিলিয়া। দেহের সামান্য শক্তি ক্ষয় করে দাঁড়াল শয়তানটার সামনে। এক ঝটকায় তাকে ফেলে দিল হেনরী, ক্রুদ্ধ চীৎকার করে বলল—কুকুরীর বাচ্চা, শয়তানী, এবার তোকেই অ্যানিমিক করবো।

—হ্যাঁ, তাই করো, আমার দেহ থেকে রক্ত শুষে নিয়ে আমাকে মেরে ফেল। লুসিকে ছেড়ে দাও।

হেনরী সিরিঞ্জের মুখ ফুটিয়ে দেয় তার দেহে। রক্ত টেনে বের করে।

সেই শুরু হল মরণ খেলা। দিনে রাতে একই সঙ্গে মা আর মেয়েকে সে ক্রমশ নীরক্ত করে দিল। অ্যানিলিয়ার রক্তের মধ্যে অল্প পরিমানে বিষও প্রয়োগ করতে থাকে। যাতে বেশীদিন প্রতিবাদ করতে না পারে সে।

তারপর এল ক্লারা। অ্যানিলিয়া ঐ ডাকিনীকে প্রথম দেখেছিল এক পার্টিতে। উৎকট সেজে নিজেকে হাজির করেছিল ক্লারা।

আর তার পাশে মাছির মত লেগেছিল হেনরী।

দুদিন বাদে ঐ মেয়েটিকেই সে দেখতে পেল হেনরীর ল্যাবরেটরীতে। অ্যানি বুঝে নিল যে এবার তাকে বিদায় নিতে হবে।

নিজের জন্যে চিন্তা তার নেই, কিন্তু লুসির জন্যে ভাবতে বসলে মাথাটা ঝিম ঝিম করে। বাচ্চা মেয়ে লুসিকে সে কি করে রেখে যাবে নোংরা পৃথিবীতে? কে দেখবে তার আদরের মেয়েকে?

তার চেয়ে যদি··· ···

এরপর ভয়ঙ্কর সম্ভাবনাটা ভাবতে গেল অ্যানিলিয়া। পারল না। তার ভাবনার ছেদ ঘটেছে।

কোলে শায়িত ঘুমন্ত লুসি, আধবোজা ঠোঁট, কপালে চুল। সে পরম মমতায় তার গালে চুম্বন দিল। বলল—ভাখ আমাকে বাদ দিয়ে দশটি বছর তুই একা কাটিয়ে দিলি।

মনে পড়ল তার সেই দিনটার কথা যেদিন তাকে নীরবে চলে যেতে হয় এই পৃথিবী ছেড়ে। অ্যানি যেন বুঝতে পেরেছিল যে তার যাবার দিন এসেছে।

কিচেনে ঢুকেই বিশ্রী গন্ধ নাকে আসে তার। বাইরে এক্সমাস ইভের মধুব রাত, দেওদার গাছে ঝুলছে অনু-আলো, পিয়ানোর সামনে বসে ছোট্ট লুসি বাজাচ্ছে যীশুর অতি পরিচিত প্রার্থনা সঙ্গীতের সুর—Let there be light.

আলো, আমার আলো। ভাবতে ভাবতে দেশলাই জ্বালল অ্যানিলিয়া। রাত হয়েছে, দমকা হিমেল বাতাস সব যেন কাঁপিয়ে দেবে। দেখতে পেল সে লুসিকে, ছোট্ট দেহটা ঝুঁকে রয়েছে সোনালী রীডে।

এরপর তার কিছু মনে পড়ে না। অসহনীয়একটা প্রাণ-বিদীর্ণ করা জ্বালা। একটা অনুভূতি, ওহ কি কষ্ট! অ্যানিলিয়া ভাবতে পারে না।

তারপর সে কোথায় যেন মিশে গেল। দেহটা আগের চেয়ে হালকা, ভাসতে ভাসতে হাঁটে। লুসিকে দূর থেকে দেখে।

তার কান্না শুনলে সে গুমরে ওঠে। তাইতো তাকে ছেড়ে সে কোথাও যায় না। মধ্য মিশরের তপ্ত পরিবেশে থাকতে থাকতে দম বন্ধ হয়ে আসতো অ্যানিলিয়ার। আবার নিউইয়র্কের তুষার ঝরা শীতের রাতে আবরণ হীন আত্মা কেঁপে উঠতো।

মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে সব যেন ভুলে যেত সে। সে

জানে, ঐ হেনরী আর ক্লারার মিলিত ক্ষুধা লুসিকে পরিণত করবে প্রেতে। কিন্তু বাধা দেবার ক্ষমতা তার ছিল না।

অবশেষে একদিন সে প্রাণ সত্তা ধারণ করে জীবন্ত করে তুলল অ্যান্নুবিসের পাথর দেহ। দু চোখে ঘৃণিত রক্ত এনে সে প্রচণ্ড ভয় দেখাল হেনরীকে।

সে রাতেই হেনরী মরে গেল। ক্লারা মরল অপঘাতে। কিন্তু····

সে রাতে তার লুসিও মিশে গেল বাতাসে। যে লুসির জন্যে অ্যানিলিয়া সেজেছিল ঘাতিকা, তাকেও সে ধরে রাখতে পারল না।

হত্যা থেকে জন্ম নেয় নতুন হত্যা।

তবু মনে হয় এই হয়তো লুকিয়ে ছিল তার অবচেতন মনে যে লুসি পৃথিবীর, তাকে সে হাতের মুঠোর মধ্যে পায় না। দুজনের মধ্যে জমে ওঠে দীর্ঘ ব্যবধান। কিন্তু লুসি আজ তারই মত বাতাসে ভেসে বেড়ায়।

তারই মত শুয়ে থাকে নিস্তব্ধ ভূমিতে। কিন্তু তার লুসিকে সে বাঁচাতে পারেনি, ঐ জঘন্য ডাকিনী তন্ত্রের প্রভাবে সে হয়েছে জীবন্ত কঙ্কাল। তার কষ বেয়ে রক্ত গড়ায়, তার চোখে ভাসে তৃষিত আশঙ্কা।

প্রেতিনী হলেও তার কাছেই আছে, আছে তার হৃদয়ের পাশাপাশি।

ঘুমন্ত লুসির মুখের দিকে তাকিয়ে তার মনে হল এ মেয়ে কোন পাপ, কি কোন অন্যায় করতে পারে না।

চমক ভাঙতে লুসি দেখল মা নেই। ছেয়ে আছে ধোঁয়াভরা অন্ধকার। সে চীৎকার করে ডাকল—মা!

কেউ জবাব দিলনা। দূরে....আরোও দূরে আলুলায়িত কেশ মেলে এগিয়ে আসছে অনন্ত রাত। আপাততঃ লুসি সেখানে খুঁজবে না তার তৃষিত মনের শান্তি। সে ভ্রমণ করবে পৃথিবীতে, মানুষের

সুখের ঠিকানা ছিঁড়ে দেবে, গর্ভবতী জননীকে করবে ভীতা, আশাবাদী যুবকের হৃদপিণ্ড উপড়ে ফেলবে।

তার অনেক জ্বালা আছে, আছে ধিকি ধিকি জ্বলা আগুন।

লুসির দেহটা কালো একবিন্দুর আকার ধারণ করে ভেসে চলেছে মলিন ধোঁয়ার মধ্যে।

## হ্যালো, অপারেশন ডেডলাইন

—হ্যালো—

ছোট্ট দুটি শব্দ যেন ঢেউ তুলল ইথারে। যা ছিল শান্ত, জীবনহীন এবং মৃত, এক মুহূর্তে তা পরিণত হল জীবন্তে। যা ছিল জড়, মাটির নীচে প্রোথিত অবমানিত আত্মার ক্রন্দন, তা হল প্রাণবন্ত, হল অসীম আনন্দের উল্লাস।

ঐ শব্দটির জন্যে উৎকণ্ঠিত হয়েছিল পার্ল। আজ সারাদিন অসহ্য যন্ত্রনার মধ্যে ছটফট করতে করতে পার্ল শুধু টেলিফোনের ঝঙ্কারের অপেক্ষা করেছে।

সে জানে, ঐ আর্তনাদ তার জন্যে বহন করবে শুভ সংবাদ। এই নির্জনে, বিষণ্ণতার মধ্যে, হিমেল হাওয়ার কান্না শুনতে শুনতে প্রসব ব্যথায় জর্জর পার্ল শুনতে চেয়েছিল তার স্বামী ডিউকের কণ্ঠস্বর।

হাজার মাইল দূরে বোস্টনে বসে আছে ডিউক। আর এখানে উইকিহামা নারসিং হোমে সে একা।

বন্ধ ঘরে অ্যালকোহলের গন্ধ, আর আছে তাজা রক্তের সুঘ্রাণ। অ্যাপ্রন পরা নার্স যেন ভূতের মতো পিছলে হাঁটছে করিডর ধরে।

কি বিশ্রী অঞ্চলে নারসিং হোমটি অবস্থিত। সামনে ধু ধু বিস্তৃত সল্ট লেক সিটি, অদূরে ইউটা পর্বত। আশে পাশে কোনও মানুষ নেই। বেছে বেছে তাকে এখানে ভর্তি করেছে ডিউক।

একুশ বছরের ভীরু মেয়ে পার্ল এই প্রথম জননী হতে চলেছে। এতদিন সে ছিল বলগা হারা উল্লাসে ভরা, অস্তিত্বের মধ্যে নবজাতকের ক্রন্দন শুনতে পাচ্ছে যেন। ঘুমহারা রাতে সে যেন হৃদপিণ্ডের স্পন্দনে অনুভব করছে ঐ সন্তানের ধুক ধুক শব্দ।

কে আসছে, কে আসছে তার জঠরে, সে কি হাজার হাজার বছরের পুরোনো প্রাণ? সে প্রাণে আছে শতাব্দীবাহিত মলিনতা? আছে অহংকার?

নাকি সে হল ভোরের আলোর মত নিষ্পাপ?

ফোনটা আবার বেজে ওঠে। যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যাচ্ছে পার্লের দেহ। সে কোন রকমে বলে, "সিস্টার, প্লীজ, আমাকে একটু তুলে বসিয়ে দিন। ডিউকের ফোন। আমি জানি ........

কথাগুলো বলবার মুহূর্তে তার যন্ত্রণা ক্লিষ্ট শুকনো ঠোঁটে আনন্দ-ছায়া কাঁপে, আবার মিলিয়ে যায়।

অন্ধকার ঘরে জ্বলছে মৃদু আলো, ওর হাতের অলঙ্কারে ঝলসে ওঠে। আবছা অন্ধকারে আসন্ন জননী পার্লের দেহ কাঁপে অজ্ঞাত আশঙ্কায়। হিম-হাওয়া এসে আঁকড়ে ধরে ওর রাত পোষাক, ধূ ধূ শূন্যতার শব্দ আঘাত হানে ওর শ্রবণ শক্তিকে।

কাঁপা কাঁপা হাতে কোন রকমে রিসিভারটা তুলে ধরল পার্ল। মাউথপিসে নরম অথচ বিবর্ণ পাতলা ঠোঁট দুটি রেখে বলল—কে? ডিউক, আমি পার্ল বলছি........

কিন্তু কি শুনল সে? তার হাত কেঁপে ওঠে, সে সশব্দে পড়ে মেঝেতে। সিস্টার ছুটে এল, তাকে ধরে ধরে বসাল বিছানাতে। বলল—উত্তেজিত হবেন না, একটু ঘুমোবার চেষ্টা করুন।

—না, আমাকে ছেড়ে দিন, আপনি কি জানেন, ঐ শব্দটি শোনবার জন্যে আমি কতোক্ষণ অপেক্ষা করছিলাম?

বাচ্চা মেয়ের মত মাথা নেড়ে চুল ঝাঁকিয়ে বিড়বিড় করে বলে ওঠে পার্ল।

টেলিফোনটা আবার আর্তনাদ করে, মনে হয় যেন একটা দুর্দান্ত শক্তিবান বন্য পশু আহত আক্রোশে নখ দিয়ে আঘাত করছে শক্ত লোহার খাঁচায়।

পার্ল আবার উঠে দাঁড়াতে গেল কিন্তু পারল না। গর্ভ যন্ত্রণায় সে তখন ছটফট করছে। কিন্তু তাকে যে উঠে দাঁড়াতেই হবে, কেননা এই নীরব মধ্য রাতে ঐ রিসিভার তারজন্যে বহন করে এনেছে বহু প্রতীক্ষিত সংবাদ।

শুধু কি সংবাদ?

না, ঐ ইথার বাহিত শব্দ বহন করছে হাজার মাইল দূরে বসে থাকা ডিউকের অনেক আশীর্বাদ। এবং তার উষ্ণ হৃদয়ের তপ্ত আলিঙ্গন।

মুহূর্তের মধ্যে পার্লের মনে পড়ে বিয়ের আগের সেই সোনালী দিনগুলো। তার শান্ত চেতনার মধ্যে হারিয়ে যাওয়া দিনেরা হঠাৎ ফিরে আসে, যদিও, এখন, পার্লের চেহারার মধ্যে রূপ লাবণ্য অবশিষ্ট নেই, আছে চোখের কোণে ক্রমশঃ ঘনীভুত রেখার জাল, ঠোঁট বিবর্ণ, চিবুকের নীচে ঝুলে পড়েছে মাংসপেশী। অথচ মাত্র এক বসন্ত আগে এই পার্ল ছিল সত্যিকারের রূপসী।

শব্দটা আবার শোনা গেল, সেই বিভ্রান্তির অন্তহীন শব্দের দ্যোতনা।

পার্ল এবার হৃদযের সবটুকু শক্তি সঞ্চয় করে উঠে দাঁড়ালো, খোলা জানালা দিয়ে সল্ট লেক সিটির ভৌতিক নীরবতা তাকে গ্রাস করে, ইউটা পর্বতের বুকে জ্বলতে থাকা আলোক দীপ যেন যাদুকরী হাতছানি দিয়ে আকর্ষণ করে যন্ত্রণা দগ্ধ পার্লের ছিন্ন বিচ্ছিন্ন সত্তাকে।

মনে হয়, যদি সে তার চার দেওয়ালের ভাঙন থেকে মুক্তি নিয়ে হাজির হতে পারতো ঐ কুয়াশা-মলিন পাহাড়ে, তাহলে তার তৃষিত আত্মা পেত কাঙ্ক্ষিত শান্তি।

আর ঐ দম বন্ধ করা গা গুলিয়ে ওঠা অ্যালকোহলের গন্ধটা ? মনে হয় যেন মৃত্যুর কথা ঘোষণা করেছে।

পাল´ কাঁপা হাতে রিসিভারটা আঁকড়ে ধরে, তার কাছে এখন ওটা শুধু টেলিফোন নয়, ওটা হলো তার শেষতম অবলম্বন। যেটাকে আশ্রয় করে পাল´ তার এই নিদ্রাবিহীন দীর্ঘতম শীতল রাত্রিটি অতিক্রম করতে পারবে।

—হ্যালো........

ভীত কণ্ঠে পাল´ প্রশ্ন করে।

সঙ্গে সঙ্গে রিসিভার হাত থেকে পড়ে গেল তার, সেই কণ্ঠস্বর, সেই একই অপার্থিব জান্তব আর্তনাদ।

কোন মানুষের গলা কি অত কর্কশ এবং আতঙ্কিত হতে পারে ?

আর ঐ শব্দ দুটি ? কি তার মানে ?

পাল´ স্পষ্ট শুনেছে। বহুযুগের ওপার থেকে ভেসে আসা পিশাচ কণ্ঠ ঘোষণা করেছে তার মৃত্যু দণ্ড। বলেছে—অপারেশান ডেডলাইন।

—সিস্টার, সিস্টার· ····

ক্ষীণ কণ্ঠের আওয়াজ পৌঁছলো না সিস্টারের কানে, তাই কেবিনে এক বুক আতঙ্ককে সঙ্গে করে জীবন মৃতা হয়ে পরে রইল ডিউকের পত্নী, একুশ বছরের পাল´।

কোথায় যেন টং টং করে রাত বারোটার সঙ্কেত শোনা যায়।

জিরো আওয়ার !

পালে´র কানে কানে কে বুঝি দমকা বাতাসের মত বলে গেল। এই মুহূর্তে পৃথিবীর অশরীরীদের ঘুম ভাঙে। তারা মানবদেহের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে প্রতিশোধ নিতে চায়।

কিন্তু পাল´ তার ঐ ছোট্ট জীবনে কোন অন্যায় করে নি ? তবে ? কেন তার ওপর এত আক্রোশ ?

তবে কি সবটাই তার কল্পনা ? সময়ের এক সংক্ষিপ্ত বিরতিতে

পাল´ কি হারিয়ে ফেলছে তার মনের বাস্তবতা? তাই শুনছে ঐ অপার্থিব কণ্ঠস্বর? যা তার নিঃসঙ্গ অরক্ষিত মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করে তাকে তিল তিল করে নিয়ে চলেছে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে।

ঐ আবার, ঐ আবার, শোনা গেল টেলিফোনের অসহ্য যান্ত্রিক শব্দটা?

যেন হাইওয়ে দিয়ে ছুটে চলেছে অনেকগুলি যন্ত্র যান অথবা টিউব রেলে ঘটেছে বিস্ফোরণ।

নিপীড়িত ইস্পাতের করুণ আর্ত চীৎকার রাত্রির বুকে ধ্বনিত হয়ে বাজতে থাকে।

তখনই নিজের জঠরের মধ্যে কোন এক অনাগত নবজাতকের স্পন্দন শুনতে পায় পাল´।

এই দুটি শব্দের মধ্যে কোন সাদৃশ্য আছে কি?

তা কি করে সম্ভব? কেননা ইস্পাতের কাতর আর্তনাদের উৎস হাজার বছরের মৃত আত্মার করুণ বিলাপে আর আগামীদিনের যে শিশুটি কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ভূমিষ্ঠ হতে চলেছে তার কান্নাতো এই পৃথিবীর অপরিচিত।

শব্দ দিয়ে তৈরী করা ভয়ঙ্কর ব্যূহের মধ্যে আটক পড়ে হাঁফাতে থাকে পাল´।

কিন্তু তাকে আবার রিসিভারটা তুলে নিয়ে শুনতে হবে। এবার যদি ডিউকের কণ্ঠস্বর শোনা যায়।

সে স্খলিত পায়ে কোন রকমে উঠে গিয়ে গ্রাহক যন্ত্রটা হাতে তুলে নিল। তারপর মৃত্যুর আগে শেষ কথা বলার মত ফিস ফিস করে বলল—হ্যালো, আমি পাল´ বলছি। কে তুমি? ডিউক? আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে।

আবার সেই চিৎকার, রক্ত জল করা শীতল গর্জন। এবার পাল´ পরিষ্কার শুনতে পেল·······

—ম্যাডাম, আপনার কেবিন ঘরের চারপাশে তাকিয়ে দেখুন। দেখতে পাবেন সর্বত্র ছড়ানো আছে আমার নীরব উপস্থিতি। ঐ স্বল্প আলোকিত আসবাব বিহীন রোগাক্রান্ত শীর্ণ ঘরের প্রতি ধূলি-কণাতে মিশে আছি আমি········

পার্ল ভাল করে চারিদিকে দেখল; তার সাদা চাদর পাতা লোহার খাট, একটি সাইড টেবিল, সেখানে ওষুধের শিশি, ইন-জেকসান অ্যাম্পুল, এককোণে দেওয়ালে বসানো র‍্যাক, তাতে কয়েকটি বই, সেণ্টার টেবিলে ধূসর ফুল কাটা টেবিল ক্লথ, মাটির ফুলদানিতে সদ্য ফোটা ডালিয়া, উত্তরে হাওয়ায় আলোড়িত সাদা ব্রোকেটের পর্দা, এমন কি নীলাভ মেঝেতে ফেলে রাখা তার রবারের দুটি শ্লিপার—সর্বত্র অন্বেষণ করল সে।

কোথায় আছে ঐ অপার্থিব কণ্ঠস্বরের মালিক ? কোথায় ? কোথায় ?

যেন তার মনের ঐ প্রশ্নটা শুনে ফেলেছে জান্তব কণ্ঠের সত্তা। আচমকা হাসির শব্দ শোনা যায়। সেই হাসিটা গমকে গমকে বাড়তে থাকে, আচ্ছন্ন করে দেয় পার্লকে।

রিসিভারটা হাত থেকে সশব্দে ফেলে দিয়ে পার্ল মনে মনে বলে —আমি আর পারছি না, পারছি না, ডিউক, ডিউক, তুমি এখন কোথায় বসে কি করছ ? হায় ! কাল সকালে যখন তুমি অনেক উৎসাহ নিয়ে দেখতে আসবে তোমার নবজাত সন্তানকে, জানি এই পার্লকে আর দেখতে পাবে না। আজ রাতে সে হারিয়ে যাবে। হারিয়ে যাবে চিরদিনের জন্যে।

কিছুক্ষণের ভৌতিক নীরবতা এসে আবার গ্রাস করে দেয় নার্সিং হোমের বন্ধ কেবিন। পার্লের মনে হয় সে যেন আবার হারিয়ে গেল বিস্মৃতির অঞ্চলে। তখন তার কানে শুধু ইউটা নদীর গর্জন এবং সল্ট লেক সিটির ঘুমন্ত নাগরিকদের শীৎকারের শব্দ।

তবে এই নীরবতার বিস্তৃতি মাত্র কয়েকটি মুহূর্ত। তারপর

ঝলমলে তারার চুমকি লাগানো কালো মখমলের আকাশ থেকে খসে পড়ে একটি উলকা। টেলিফোন আবার আঁৎকে ওঠে।

পার্ল জানে, এবারে সে ক্রমশঃ মৃত্যুর অতলে তলিয়ে যাবে। শরীরের মধ্যে অসহনীয় যন্ত্রণা, বাইরে হিমের রাতের বিস্তৃত নিঃসঙ্গতা এবং তারই পটভূমিতে ঐ নির্মম টেলিফোনের নিষ্ঠুর প্রতিধ্বনি।

সব মিলিয়ে পরিবেশে আরোপিত হয়েছে বীভৎস ভৌতিক আবেশ। যেখানে রক্ত মাংসের মানুষ বাঁচাত পারে না।

—হ্যালো........

এবার পার্ল জানে কি শুনবে সে! তবু রিসিভারটা ছাড়লো না। মৃত্যুর আগে অদৃশ্য প্রতিদ্বন্দ্বীর শেষ কথাটি শুনে যেতে চায়। না হলে নরকে গিয়ে তার মন থাকবে তৃষিত।

—হ্যালো ম্যাডাম,

সেই ভৌতিক কণ্ঠস্বর বাজতে থাকে। মনে হয় যেন সন্দেহের আকাশে ঘুরে বেড়ায় অবিশ্বাসের কুটিল মেঘ। দুঃস্বপ্নের নিবিড় আতঙ্ক গ্রাস করে পার্লকে। নিঃশ্বাস নিতে গিয়ে বুকে ব্যথা পায় সে। তার মনে হয়, পৃথিবীতে বেঁচে থাকার দিনগুলো ক্রমশঃ ফুরিয়ে আসছে।

—ম্যাডাম, আমার কথা শুনুন। আমি হলাম অপারেশান ডেডলাইন। আজ মধ্য রাতে যে শিশুটি জন্ম নেবে সে কোনদিনই আলোকিত পৃথিবীতে নিঃশ্বাস নিতে পারবে না। ভুমিষ্ঠ হবার সঙ্গে সঙ্গে তাকে গ্রাস করব আমি। আমার ইচ্ছেমত পরিচালিত করবো তার প্রতিটি চেতনাকে। সে হবে এক তৃষিত আত্মার প্রতিভূ।

—না, না, কান্নাভেজা আর্দ্র গলাতে আসন্ন জননী পার্ল অনুনয়ের কাতর ভঙ্গিতে বলে, আমার এক মাত্র সন্তানকে এভাবে কেড়ে নেবেন না।

টেলিফোনের মধ্যে হাসির আওয়াজ শোনা যায়। তাচ্ছিল্য করা কঠিন হাসি। সেই হাসির মধ্যে ভেসে আসে গর্বিত কণ্ঠস্বরের

কঠিন ঘোষণা—সন্তান ? মিসেস পার্ল, আপনি কি ভালবাসাকে বিশ্বাস করেন ?

—হ্যাঁ, করি, মৃদুকণ্ঠে পার্ল বলে ওঠে।

হাসিটা এবার পরিণত হয় সাপিনীর নীরব হাসিতে। শোনা যায়—আপনি কি জানেন এই মুহূর্তে যখন আপনার যন্ত্রনাবিদ্ধ দেহ নারসিং হোমের নির্জন কেবিনে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে তখন বোস্টন শহরের সবচেয়ে অভিজাত বারে বসে নগর নন্দিনী নোরার দেহ থেকে সুষমা শুষে নেবার জন্যে ব্যস্ত আছে আপনার স্বামী ডিউক ?

—না, একথা আমি বিশ্বাস করি না, আপনি জানেন না যে ডিউক আমাকে কতটা ভালবাসে.........

বলতে বলতে পার্লের মনে পড়ে ডুবন্ত চাঁদের সেই দিনগুলো। যখন মনের মধ্যে ছড়ানো ছিল অসংখ্য রঙ। সত্যিই ডিউক তার আসন্ন প্রসবা স্ত্রীকে ভুলে মেতে উঠেছে শরীর অন্বেষণে ?

হতে পারে, পৃথিবীর কোন মানুষের প্রতি এখন আর বিশ্বাস নেই পার্লের।

সেই ভৌতিক কণ্ঠস্বর আবার বলে—ওসব দিনগুলো এখন শায়িত আছে গ্রেভ ইয়ার্ডের নীচে, ওরা আর কোনদিন জীবন্ত হবে না। আপনার সামনে দাঁড়িয়ে আছে বিবর্ণ দিনের অবিশ্বাস।

—হয়ত তাই, পার্ল আত্মনিবেদনের ভঙ্গিতে স্বীকার করে।

—তাহলে কি লাভ এই মুখোস করা জীবনের। আসুন, আত্মার অবিনাশি শক্তিকে আশ্রয় করুন। মানবিক জীবন শুধু দেয় দুঃখ জ্বালা যন্ত্রণা, কিন্তু পৈশাচিক জীবনে ছড়ানো আছে অব্যক্ত অনুভূতি।

সামান্য ক্ষণের নীরবতা ভেঙ্গে পরাস্ত পার্লের মৃদু কণ্ঠস্বর ভেসে ওঠে, না না, আমি সমস্ত অন্যায় অত্যাচারের পার্থিব জীবনকে বোকার মত আঁকরে ধরতে চাই। আমার এই সুখটুকু আপনি কেড়ে নেবেন না। তাছাড়া আর কয়েক মুহূর্তের মধ্যে আমার উত্তরাধিকারী এসে পা রাখবে এই ভালবাসা ও ঘৃণার পৃথিবীতে।

একটু থেমে, ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে পার্ল স্বগতোক্তির মত বলে—তাকে মানুষ করার অঙ্গীকার রয়েছে আমার ওপর।

কি এক নিবিড় শান্তির হাত তাকে গ্রাস করতে চায় তখনই আবার শোনা যায় পৈশাচিক কণ্ঠের ভৌতিক চিৎকার—সে সুযোগ আপনাকে আর দেওয়া হবে না মিসেস পার্ল। মনে রাখবেন আজ রাতেই আপনাকে মরতে হবে, মরতে হবে।

লাইন কেটে গেল। রিসিভারটা হাতে রেখে দাঁড়িয়ে রইল পার্ল। দাঁড়াতে পারলো না, তার শীর্ণ দেহটা আবার মলিন মেঝেতে আছড়ে পড়ল।

কিছুক্ষণ বাদে রক্তে মাখা একটি শিশু জন্ম নিল ঘৃণার পৃথিবীতে।

ফোনটা একা আর্তনাদ করে

—হ্যালো, হ্যালো—

পার্ল কোন জবাব দিতে পারে না। ওকে ঘিরে ধরেছে শয়তান নৈঃশব্দের নিঃসীম আতঙ্ক। আচমকা কার পায়ের শব্দ যেন ও শুনতে পায়। নিজের অজ্ঞাতে একটি স্নেহ ভরা হাত উঠে যায় বিকৃত শিশুর কপালে।

টেলিফোনটা বাজতে থাকে। পার্লের বুকের মধ্যে শ্বাপদ সঙ্কুল অরণ্যের দামামা বেজে ওঠে।

এবং নেমে আসে রাশি রাশি অন্তিম অন্ধকার, বিষের কুয়াশা এসে ঢেকে দেয় ঘন নীল আকাশের সৌন্দর্য। অন্তহীন আতঙ্ক নিয়ে ভাষাহারা দুটি বিস্ফারিত ফ্যাকাসে চোখের বিবর্ণ তারা শূন্যে তাকিয়ে থাকে। শিশুটা যেন একবার কেঁদে উঠে। তার রোগা সরু লিকলিকে হাত তুলে নিস্ফল প্রতিবাদ জানাতে চায়।

জননী পার্লের মৃত করতল তার কান্না থামাবার বৃথা চেষ্টা করে। ধারাবাহিক গোঙানির মধ্যে সেই নিষ্ঠুর পদধ্বনি ক্রমশঃ শোনা যায়। কাছে, আরও কাছে, এগিয়ে আসছে হাজার বছরের মৃত আত্মা,

নবজাত শিশুর প্রতি তার দুর্মর বাসনা। সে ধীরে ধীরে গ্রাস করবে ঐ নিষ্পাপ শিশুকে।

সে এসে গেছে। ব্রোকেটের পর্দা উড়ছে। শিশুর কান্না গেছে থেমে। তারপর পালের দেহটা যেন একবার, শুধু একবার মাতৃত্বের শেষ প্রতিরোধ তুলে অতৃপ্ত আত্মার উদ্যত থাবা থেকে ছিনিয়ে নিতে যায় দশ মাসের তিল তিল যন্ত্রনা আর পরিশ্রমের সন্তানকে।

পারে না, দুর্বল পাল নীরবে শুয়ে থাকে। অবর্ণনীয় আতঙ্কের আভাস তার ঠোঁটে। সেই অদৃশ্য ছায়াময় শরীর দুহাতে তুলে নেয় সদ্যোজাত রক্তাক্ত বাচ্চাটিকে। তারপর শূন্যে ভাসিয়ে দেয় তার অপুষ্ট দেহ।

পালের অবশিষ্ট সাহসের অন্তিম নিঃশ্বাস শোনা যায়। শ্রুতির মধ্যে অস্তিত্ব জুড়ে বেজে উঠে দূরাগত ট্রেনের শব্দ! হঠাৎ পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় শুরু হয় আদিম প্রেতাত্মাদের শিহরিত উৎসব।

তারপর সমস্ত পৃথিবী জুড়ে, আকাশ বাতাসকে আলোড়িত করে বাজতে থাকে টেলিফোনের বীভৎস যান্ত্রিক আর্তনাদ।

ঠিক তখন শহর বোস্টনের সবচেয়ে অভিজাত বার থেকে রাতের ডিনার শেষ করে ফ্ল্যাটে ফিরছে ডিউক। তার বাজ তীক্ষ্ণ নাসিকায় অথবা ইস্পাত কঠিন চিবুকে সদ্য সমাপ্ত শারীরীক আলাপনের সুখ নির্মম অভিব্যক্তি।

তার দেহের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে হাঁটছে নোরা। স্বল্পতম রাত্রিবাসে সজ্জিতা এক ক্যাসানোভা যেন।

উইকিহামা নারসিং হোমের সতেরো নম্বরের কেবিনে নার্স এসে দেখে পেসেন্ট পাল রক্তের মধ্যে পড়ে আছে। তার হৃদযন্ত্রের স্পন্দন চিরতরে স্তব্ধ হয়ে গেছে কয়েক ঘণ্টা আগে।

এই অলৌকিক ঘটনার কোন কারণ সে খুঁজে পায় না।

ইউটা পাহাড়ের নিভৃত গুহাতে বন্য শয্যায় শায়িত অপুষ্ট এক সদ্যোজাত শিশুর সামনে তখন চলেছে তৃষিত আত্মার উল্লাস।

আবছা ছায়ার মত দেখা যাচ্ছে এক শীর্ণা কিশোরীকে। দেখা যাচ্ছে, আবার মিলিয়ে যাচ্ছে।

তার ঠোঁটে রয়েছে রক্ত পানের তীব্র তিয়াস, দুটি চোখে মৃত্যু হীন উপত্যকার গভীরতা। সে লোভী জিভ দিয়ে লেহন করছে পালে´র সন্তানকে।

তারপর তার চোয়ালের দুটি তীক্ষ্ণ দাঁতে স্বাদ নিচ্ছে রক্তাক্ত শিশুর লোনা তরলের।

সেই ছায়া মূর্তি নীরবে হাসতে থাকে। তারপর ফ্যাকাসে ছোট্ট দেহের দিকে তাকিয়ে আপনমনে বলে —আমিও একদিন ঠিক তোর মত ছোট ছিলাম, কিন্তু কেউ আমার স্বপ্নের পৃথিবীর রং উজ্জ্বল করেনি। বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে চোখের সামনে দেখা দিল কালো পর্দা ঢাকা পরিবেশ····

····তারপর একদিন, চোদ্দ বছরের একটি শীর্ণা কিশোরী হারিয়ে গেল শহর নিউইয়র্কে। তার মনে তখন প্রতিহিংসার আগুনে পুড়ে কালো হচ্ছে একটি দগ্ধ চেতনা।

ড্রাগনের লাল চোখ থেকে ঝড়ে পড়ছে কুৎসিত ব্যভিচার, নগ্নিকা ক্লারা হাসতে হাসতে এগিয়ে আসছে সাইক্রিয়াট্রিস্ট হেনরীর প্রায় অচেতন দেহের দিকে।

আর শৃগাল মুখের বিকট মূর্তি অ্যানুবিস পাথর চোখে রক্ত ঝরাচ্ছে।

### উইলো বনের কান্নাকুঠী

দূরে কোথাও বাজ পড়ল !

সেই সঙ্গে বৃষ্টি যেন বাঁধন হারা বুনো বাইসনের মতো ছুটে এল। পুরু কাঁচের উইণ্ড-স্ক্রীনের ওপর বর্শার মতো এসে পড়ছে

হিমেল বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা। দমকা বাতাস যেন ঘোষণা করেছে সভ্যতার অবলুপ্তির। নিকষ কালো অন্ধকার ঢেকে রেখেছে সন্ধ্যার আকাশ। মনে হয় যেন সভ্যতা আজ রক্তাক্ত আততায়ীর শানিত ছুরিকা স্পর্শে নিহত হবে।

উন্মত্ত বৃষ্টি ধাবার স্পন্দনে বুঝি চলেছে সেই জঘন্য হত্যার সবব প্রস্তুতি।

নিপুণ ড্রাইভাব বলে পলেব খ্যাতি আছে, এব আগে সে অনেক-বার মোটর বেসে অনাযাসে জিতেছে। কিন্তু এখন তাব হুড খোলা অলিভ রঙা রেসিং কাবকে উন্মাদ বৃষ্টি ধাবা যেভাবে হিংস্র আক্রোশে দংশন করছে তাতে আব বেশীক্ষণ তাবপক্ষে এক তরফা লড়াই কবা সম্ভব হবে না।

নেহাত মনের জোবে পল এখনও পিছল পথে তাব গাড়ীটিকে চালিয়ে নিয়ে চলেছে। এক পাশে বিবাট পাহাড অন্যদিকে গহন পার্বত্য ঢালু পথ। সেখানে প্রতি মুহূর্তে মৃত্যু এসে নীববে দাঁডায মাথার শিয়বে।

বিরাট পাহাড বুঝি কানে কানে বলে—এস, আমার উত্তুঙ্গ শিখরে তোমার জন্য সঞ্চিত আছে হিমার্ত শয্যা।

গহন গিরিখাদ যেন বলতে চায়—এখানে এস, আমার নিভৃত অন্তরে আমি সাজিয়ে রেখেছি মৃত্যু পথিকের জন্য একমুঠো সমবেদনা।

তাবপর যদি সেটি হয় এমন বৃষ্টি মুখর রাত তাহলে লেক সুপিরিয়বের পার্শ্ববর্তী এই গিরিপথটি যে মৃত্যুর এক রক্তিম আসব হয়ে উঠবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

আর অগ্রসব হতে পাবল না পল। তার সমস্ত পোষাক ভিজে চুল দিযে টপটপ করে জল ঝরছে। হিমশীতল বৃষ্টি কণারা বুঝি তার দেহের উষ্ণতা গ্রাস করবে। এবং অবশেষে গিরি কন্দরে শোয়ান থাকবে নীরব একটি শীতল মৃতদেহে।

মৃত্যুর দামামা শুনে ভেঙে পড়ার মত যুবক পল নয়। সে ভাল করে চারিদিকে দেখবার চেষ্টা করল। বৃথা চেষ্টা, কেননা নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের আবরণ ভেদ করে তার দৃষ্টি শক্তি এক ইঞ্চি পথ অতিক্রম করতে পারল না।

হঠাৎ আবার সশব্দে বাজ পড়ে। মুহূর্তে ঝলসে ওঠা আলোক রোশনাইতে পল যেন দেখতে পেল সরু পথটি এঁকে বেঁকে গেছে পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত একটি কুটিরে। এই নির্জনে কুটিরের অভাবনীয় উপস্থিতিতে অবাক হয়ে গেল পল।

এই দূর বিস্তৃত উইলো আর সাইপ্রাসের অরণ্যে শুধুই প্রকৃতির নিষ্ঠুর খেলা। সেখানে মানুষ বাঁচতে পারে না। কিন্তু আজ রাতে জীবন্ত ফিরতে হলে মানুষের সাহচর্য তার একান্ত প্রয়োজন।

সাবধানে পল পা রাখল আঁকাবাঁকা সরু পথে। পিচ্ছিল পথ অতিক্রম করতে অনেক সময় নিল সে, মাঝে মাঝেই সশব্দে বাজ পরছে তাৎক্ষণিক প্রভাতে ভরে উঠেছে পরিবেশ।

পল এবার আরো অবাক হয়ে গেল। যখন সে দেখল যেটিকে সে কুটির বলে ভুল করে ছিল সেটি আসলে একটি বড় বাড়ি।

এখানে এসে আচ্ছন্নের মত থমকে দাঁড়িয়ে রইল পল, কেননা, এখানে সে কার নাম ধরে কিভাবে ডাকবে বুঝতে পারল না।

মনে মনে হেসে উঠল না। কেননা তার সম্বোধনের উত্তর দেবার মত কেউ কি হাজির আছে এই উইলো বনে?

হাজির আছে ঐ খাড়া পাহাড়, আছে গহন খাদ আর অবিশ্রান্ত বৃষ্টি ধারা, আছে কাঁটা বসানো সাইপ্রাসের সিক্ত পাতারা, লতিয়ে পড়া উইলোর গুচ্ছ গুচ্ছ ফুলেরা।

কিন্তু মানুষ? অবান্তর কল্পনা।

দমকা হাওয়ায় সে তার চেতনার জালকে ছিঁড়ে দিল। আবার বাজ পড়ে, এবার সে দেখতে পায় ঐ নিঃসঙ্গ বাড়ীটির সামনে একটি কাঠের ফলকে লেখা আছে—দা ভিলা অব ক্রাইজ·······

তার মানে? দা ভিলা অব ক্রাইজ? কান্না-কুঠী, নিজের মনে ভাবতে থাকে পল। এই বিষণ্ণ নামের অর্থ কি?

তার সমস্ত ভাবনাকে অবহেলাতে উড়িয়ে দিয়ে বিস্মিত চেতনার সামনে হঠাৎ এসে দাঁড়ায় এক তরুণী মেয়ে, হাতে রয়েছে কাঁচের বদ্ধ দীপাধারে একটি হলুদ মোমবাতি, সে আয়ত আঁখিতে আশ্বাস এনে শান্ত স্বরে বলে—আমার নাম রীমা, আমি কান্না-কুঠীতে একা থাকি।

একা? একটি তরুণী মেয়ে এই বিস্তৃত অরণ্যের মধ্যে অবস্থিত নিঃসঙ্গ কুঠীতে একলা থাকে?

তার প্রশ্নের আভাস বুঝি লেখা ছিল কুঞ্চিত কপালে। মেয়েটি সামান্য হেসে জবাব দেয়—একলা মানে আমার সঙ্গী হলো ছোট ছোট শিশুরা, যাদের নিয়ে আমি গড়ে তুলেছি আমার এই নার্সারী।

তারপর মোমবাতিটাকে আর একটু কাছে এনে আন্তরিকতা ভরা কণ্ঠে বলে—কেন জানেন? আমার মনে হয় এই পৃথিবীতে শিশুরা হল সবচেয়ে অবহেলিত। আমরা তাদের ঠিক মত বড় করতে পারি না। তাই আমি আমার বাবার সঞ্চিত অর্থ দিয়ে অনেক পরিশ্রমে গড়ে তুলেছি এই কান্না-কুঠী, যেখানে আসে এমন সব ছেলেমেয়ের দল যাদের কোন পরিচয় নেই সমাজে। তারা হল আমাদের উৎকট লালসার শিকার।

—এদের নিয়ে বেশ কেটে যায় আমার নির্বাসনের দিনগুলো।

রীমা হাসলো, আগুয়ান পলের দিকে হাত বাড়িয়ে বলল—আসুন, এই দুর্যোগের রাতটি আমার কান্না-কুঠীতে কাটিয়ে যান।

আবার যেন কাছে কোথায় প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়ল, বৃষ্টিটা বুঝি জোরে শুরু হল। মনের সঙ্গে লড়াই করে করে ক্লান্ত পল ঢুকে পড়লো কান্না-কুঠীর মধ্যে।

কাঠের গেট পার হয়ে সরু নুড়ি পথ। দুপাশে উইলো গাছের সমাবেশ। আগে আগে মোমবাতি হাতে চলেছে সেই আশ্চর্য নারী রীমা, তাকে অন্ধের মত অনুসরণ করছে পল।

সুঁড়িপথ এসে মিশে গেছে পাশাপাশি দাঁড়ানো তিনটি ঘরে, সামনে একফালি সরু বারান্দা। সব মিলিয়ে ছিমছাম পরিবেশ।

পলকে হাত-ইশারায় ডাকল রীমা। খোলা আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে পলকে অকারণে বৃষ্টিতে ভিজতে হবে। তার চেয়ে আপাততঃ ঘরের মধ্যে যাওয়া যাক।

এবার রহস্যময়ী রীমার দিকে ভালো করে তাকাল পল। বয়েস কত হবে? সেটি ঠিক বুঝতে পারে না। মনে হয় খুব বেশী হলে পঁচিশ বছর। কিন্তু এই নিদারুণ নিঃসঙ্গতা রীমাকে করে তুলেছে বিষণ্ণ।

তার সমস্ত আচরণে যেন ছড়ানো আছে কি এক অবাক বিস্ময়। সহজ হবার চেষ্টা করেও সহজ হতে পারছে না রীমা। পল ঠিক বুঝতে পারছে না তার এই রহস্যময়তার কারণ কি।

পরিপাটি করে সাজানো একটি ডিভানে শ্রান্ত দেহটা মেলে দিল পল। বৃষ্টি কি একটু কমে এসেছে? কত রাত হবে? তার ঘড়িটা অনেকক্ষণ বন্ধ হয়ে গেছে।

কিছুক্ষণ বাদে রীমা আবার তার সামনে এলো। তার হাতে রয়েছে একটি কাঠের ট্রেতে এক পেয়ালা ধূমায়িত কফি। কিন্তু কান্না-কুঠীতে কি মানুষ থাকে না?

—কি ভাবছেন, ভাবছেন আমার নার্সারি হলো বানানো কল্পনা? কফি খেয়ে নিন, তারপর আপনাকে নিয়ে যাবো আমার সেই শিশুদের রাজ্যে। দেখবেন সেখানে কত আনন্দ, ভীষণ আনন্দ।

এই কটি কথা বলে পলকে শিহরিত বিস্ময়ের মধ্যে রেখে যেন দমকা বাতাসে মিলিয়ে গেল রীমা।

কতক্ষণ কেটে গেছে পলের খেয়াল নেই। কফির কাপে শীতল তলানিটুকু চুপচাপ পড়ে আছে। উইলো পাতা থেকে টুপটাপ ঝরছে বৃষ্টির জল।

তখনই যেন রক্ত হিম করা একটা তীব্র আর্তনাদ ভেসে এল

কোথা থেকে! সচকিত হয়ে ওঠে পল। উৎকর্ণ হয়ে থাকে। সে যতদূর জানে এখানে কোন বন্য জন্তুর আবাস নেই। তাহলে কে ডাকছে!

শুধু কি ডাক? পলের পদক্ষেপ বুঝি আকর্ষণ করা হচ্ছে কি এক অজানা পথে। সাধ্য কি তার সেই আকর্ষণকে উপেক্ষা করার।

পায়ে পায়ে উঠে গেল পল। আশে পাশে কোথাও রীমাকে দেখতে পেল না। রীমা যেন হারিয়ে গেছে বৃষ্টি ভেজা রাতে বাতাসের মধ্যে।

উইলো গাছেরা মাথা নেড়ে নেড়ে, সিক্ত পাতা থেকে জল ঝরিয়ে বুঝি তাদের কোন দুঃখের কথা শোনাতে চায়। বারান্দা পার হয়ে সেই সরু নুড়িপথে এসে নামলো পল। বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা এখন আর নেই, ঝরছে গুঁড়ি গুঁড়ি কণা।

বাতাস এখনও শাণিত বর্শার মত আক্রমণ করছে পলের শরীর।

একদম শেষ ঘরটিতে একচিলতে আলো জ্বলছে না! দীপ শিখাকে অনুসরণ করে পল হাজির হল সেই ঘরটিতে। ফাঁকা ঘর, একটি মাত্র আলো। দীপ বসানো আছে কাঠের গোল টেবিলে পলের বিস্ময় বাড়তেই থাকে! মনে হয় তার এই কান্না-কুঠীর বাতাস যেন ধরে রেখেছে অজানা আতঙ্ককে।

ঘরের এক প্রান্তে ধাপে ধাপে সিঁড়ি নেমে গেছে অজ্ঞাত পাতালে। সেখানে পা রাখতে গিয়ে একটু থমকে দাঁড়ায় পল। কিন্তু অনন্ত পাতাল থেকে কে যেন তাকে ক্রমাগত আকর্ষণ করছে।

পায়ে পায়ে সে নেমে গেল সিঁড়ি পার হয়ে। ঘোরানো সিঁড়ির শেষে পা রেখে নতুন বিস্ময়ের ছোঁয়াতে হতভম্ব হয়ে গেল সাতাশ বছরের বাস্তববাদী দৃঢ়চেতা পল। একি দেখছে সে? ওপরের আর্ত অন্ধকারের তলদেশে সাজানো আছে যেন এক স্বপ্নময় উদ্যান।

বিস্তৃত সবুজ প্রান্তরে ছুটোছুটি করে খেলছে নিস্পাপ ছেলেমেয়ের দল। তারা এই পৃথিবীর জীবন যন্ত্রনাকে ভোগ করে নি। তারা

জানে না মানুষের মুখোসের অন্তরালে আছে বীভৎস দগ্ধ কলঙ্কে ঢাকা মুখ। সম্পূর্ণ অজানা এই মধুর পরিবেশে এসে পলের মন ভরে ওঠে। ছোট শিশুদের সে কোনদিন পছন্দ করত না। কিন্তু এই অদ্ভুত পরিবেশে ঐ অবুঝ শিশুর দল তার চেতনাকে বহন করে নিয়ে চলেছে আলোকিত পৃথিবীতে।

নানা বর্ণের পোষাক পরা ছেলেমেয়েরা নাম না জানা কত খেলায় উঠেছে মেতে। তাদের কাকলি এসে ভেঙে দিচ্ছে নীরবতা। ওপরে যখন বৃষ্টি ঝরা রাতের অন্ধকার এখানে তখন জ্বলছে সূর্যের আলো।

ওদের মধ্যে সুন্দর পোষাক পরা রীমাকে দেখতে পেয়ে পলের মন অজানা আনন্দে ভরে ওঠে। বাচ্চা ছেলেমেয়ের দল তার কাছে এসে হাসতে হাসতে নাম বলে যায়। নানা, টায়রা, রিচার্ড, লিও—নামগুলো পলের মনে থাকে না।

রীমা এসে বলে—দেখুন, এই হল আমার নার্শারি। সেটি আমি গড়ে তুলেছি আমার অনেকদিনের পরিশ্রম দিয়ে।

অবাক লাগে, ভাবতে অবাক লাগে, পলের, কেমন করে রীমার মত তরুণী মেয়ে এই নির্জনে গড়ে তুলেছে এমন সুন্দর একটি নার্শারি।

কিন্তু ছেলেমেয়েদের হাসিখুশীতে ভরা পৃথিবীর এই ছোট্ট স্বর্গের নাম কান্না-কুঠী কেন ?

রীমাকে অবশেষে সেই প্রশ্নটা করে ফেলল পল। রীমা তার চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাল তারপর একটু হেসে ক্লান্ত বিষণ্ণ ভঙ্গীতে বলল—আমার কোন দোষ নেই, অহেতুক আগ্রহে আপনি অন্য সকলের মত হারিয়ে গেলেন।

রীমার কথার অর্থ সে বুঝতে পারে না। কিন্তু তার চোখের সামনে দেখা ঐ নিস্পাপ হাসি খুশী ভরা দৃশ্য যে ক্রমশঃ বদলে যাচ্ছে সেটা সে বুঝতে পারল। আর শোনা যাচ্ছে না ছেলেমেয়েদের

কলকাকলি। আলোকিত সূর্যের সকাল পরিণত হচ্ছে মৃত রক্তিম রাত্রে।

এবং পল জানে রাত্রি মানে ভয়—উৎকণ্ঠা শিহরণ আর বিভীষিকার বিনিদ্র আর্তনাদ। রাত্রি জানেই মনের মধ্যে লুকিয়ে থাকা আয়নার ঘুমভাঙা। তৃষিত জন্তুর জিভে ঝরে পড়া অভিশাপ।

আর রীমা? সেই অনন্যা রূপসী নিঃসঙ্গ তরুনী এই মুহূর্তে পরিণত হয়েছে জীবন্ত কঙ্কালে। আর ভয়ার্ত কোটরে পুঞ্জীভূত ঘৃণা। লোল চর্ম, বার্ধক্যে কুঁজো, দাঁতাল মুখ ব্যাদান, জান্তব ক্ষুধা নিয়ে হাসছে সেই নারী।

সঙ্গে সঙ্গে দূষিত রক্তের মত লাল আলোর ঘুর্ণিতে কেঁপে উঠল পরিবেশ। দেহ হিম করা শীতল আর্তনাদের জলরাশি এসে ভাসিয়ে দিল দৃঢ়চেতা পলের অনুভূতি।

ভৌতিক এক শব্দে মন্দ্রিত হল গোটা পরিবেশ। ভয়ঙ্কর এই দৃশ্যের সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল কুহকিনী আর্তনাদ। লোমকূপ শিরশিরিয়ে ওঠা উপলব্ধিকে সঙ্গে নিয়ে ধেয়ে এল ভয়াল সেই নারী। এক মুহূর্ত আগে যে ছিল শান্ত আশ্বাসের প্রতীক রীমা।

বিকট দর্শনা সেই রমণী অন্ধকারে তর্জনী তুলে প্রবল অট্টহাসে ধিক্কার দিয়ে বলতে থাকে—ওটা আমার স্বপ্ন, এটা আমার বাস্তব। আমি চেয়েছিলাম পৃথিবীর প্রতিটি বিমর্ষ শিশুদের মুখে হাসি ফোটাতে। কিন্তু ওরা আমাকে সে সুযোগ দেয়নি। অবশেষে আমি পরিণত হলাম কর্ণেল উইলিয়ামের রক্ষিতায়। এই কান্না-কুঠীতে আজ থেকে কুড়ি বছর আগে এমন এক বৃষ্টির রাতে কর্ণেল উইলিয়ামের পাশব ক্ষুধার সামনে হারিয়ে গেল আমায় জীবনের স্পন্দন।

বলতে লজ্জা করছে, তবু শুনুন, ঐ কর্ণেল ছিল সম্পর্কে আমার কাকা। তারপর সাতদিনের মধ্যে মৃত কর্ণেলের দেহ আবিষ্কৃত হল পাশের গিরিখাদ থেকে। বীভৎস ভয়ে চোখ দুটি তার ঠিকরে গিয়ে

ছিল। এমন ভাবে শুরু হল আমার প্রতিশোধের পালা। তারপর একটির পর একটি করে অনেক মানুষকে আমি হত্যা করেছি। একটির পর একটি মৃতদেহ জমা হয়েছে উইলো বনের গিরিখাদে। তবু আমার তৃষ্ণা মেটে নি। আজ রাতে আমার শিকার হবেন আপনি।

অদ্ভুত একটা শিহরণ এসে গ্রাস করল পলকে। সে রীমাকে আর দেখতে পেল না। নির্জন প্রান্তরের মধ্যে কাঁটা লাগানো সাইপ্রাসের অরণ্য থেকে ছুটে এলো কালো কুচকুচে একটি ডোবারম্যান কুকুর। সেটা ডেকে উঠল ব্যর্থ আক্রোশে। মাটির দিকে তাকিয়ে রক্তের মধ্যে শিহরণ বয়ে যায়…………

একটি ধবধবে সাদা…….?

নর কঙ্কাল!

শায়িত রয়েছে। লম্বায় চার ইঞ্চির মত হবে।

একটি নয়, দুটি নয়, অসংখ্য। ছড়ানো ছেটানো রয়েছে এই ভৌতিক অরণ্যে। এ সবের অর্থ বুঝতে পারে না পল। সে শুধু ভাবতে থাকে যে আর একটু বাদে এদের পাশে শোয়ানো থাকবে তার কঙ্কাল।

আবার যেন বৃষ্টিটা জোরে পড়তে থাকে। সেই সঙ্গে শোনা যায় বজ্রপাতের শব্দ। সারা আকাশ বুঝি ভেঙে পড়বে মাথার ওপর। খোলা আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে থাকা অসহায় পলের শ্রবনের মধ্যে স্রোতের মত আঘাত করছে রীমার ভৌতিক হাসির শব্দ।

সে ছুটে পালাতে থাকে। উদ্যান পার হয়ে, কান্না-কুঠীকে পেছনে ফেলে ছুটতে থাকে পল। তার ভীত সন্ত্রস্ত দুটি পা ছুটছে পিছল পার্বত্য পথে। পেছন থেকে অদৃশ্য অনুসরণ কারীর মত ছুটে আসছে রীমার মৃত কঙ্কাল। কিন্তু কোথায় শেষ হবে তার এই ছুটে চলা?

কেন না চোখের সামনে দাঁড়িয়ে আছে মৃত্যু ভরা সেই ভয়াল খাদ।

তখনো, সেই তুষার আচ্ছাদিত খাদের মধ্যে ভেসে আসছে অজানা পৃথিবীর মরণ চীৎকার। পলের মনে হয় তার আত্মা যেন অন্ধকার রাতের মধ্যে ভাসতে ভাসতে চলেছে।

অদূরে দাঁড়িয়ে আছে রীমা, একটি রক্তাক্ত ঠোঁটের, উড়ন্ত এলোমেলো শুকনো চুলের ও কঠিন চোয়ালের কঙ্কাল মাত্র। রাতটা প্রায় ফুরিয়ে এসেছে, অবিশ্রান্ত বর্ষণের শেষে নেমেছে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। কিন্তু রীমার কঙ্কাল যেন ধীরে ধীরে পরিণত হচ্ছে এক কিশোরী মেয়ের আবছা দেহতে।

তার দুটি তীক্ষ্ণ চোখের তারা থেকে ধারাবাহিক ভাবে প্রবাহিত হচ্ছে পৃথিবীর প্রতি ঘৃণা।

শুকনো পাতারা পরস্পর জড়াজড়ি করে হাওয়ার মধ্যে আনুনাসিক স্বরে কেঁদে ওঠে। তাদের বিফল কান্না প্রবাহিত হয় কান্না-কুঠীর অন্তরে। কিন্তু কেউ জবাব দেয় না।

যারা জবাব দেবে তারা এখন শায়িত আছে মরণ খাদে। তারা কোনদিন জবাব দিতে পারবে না।

## টমাস মুরের ডাইরী থেকে

আটাশে ফেব্রুয়ারী। ১৯৭৭

আমি, টমাস মুর, আমার জীবনের এক অবিশ্বাস্য কাহিনী লিপিবদ্ধ করতে চলেছি। জানি এক একটি শীর্তাত রাত্রি আমাকে ক্রমশঃ নিয়ে চলেছে মৃত্যুর দিকে। বয়সে তরুণ হলেও দেহে আমার রক্ত নেই, একটু একটু করে আমার অ্যানিমিক দেহটা হারিয়ে যাবে বিবর্ণ কঙ্কালে।

ভাবতে এখনো অবাক লাগে, কিভাবে মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে আমায় এই অবস্থা হল। মনে হয় সব যেন কল্পনা। আমার অবচেতন মনের প্রতিফলন মাত্র।

নাহলে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী এক তাজা যুবক কি করে হারিয়ে গেল নীরক্ত দেহের মধ্যে ?

এখন এই দীর্ঘ হাসপাতালের নির্জনে বসে বসে আমার মনে পড়ছে সাত দিন আগের কথা। দিনটা যেন স্নুরু হয়েছিল অশুভ সংবাদ আসবে বলে।

তাহলে ঘটনাটা বলা যাক ·······

লিখতে আমার আঙুল ব্যথায় টনটন করছে। মনে হচ্ছে যেন স্মৃতির অ্যালবামে ঘটেছে বিস্ফোরণ। তাই প্রবলভাবে পুড়ে যাচ্ছে আমার ফেলে আসা দিনগুলোর দুরন্ত কান্না এবং ভয়ার্ত আর্তনাদের প্রতিচ্ছবি।

কেন এমন হল ?

দিনটা, সেই দিনটা, ২১শে ফেব্রুয়ারী ; যখন থেকে শুরু এই সর্বনাশের········

একুশে ফেব্রুয়ারী। ১৯৭৭

আমি থাকি নিউইয়র্ক শহরের ম্যানহ্যাটন দ্বীপের পূর্ব প্রান্তে ইষ্ট নদীর কাছে। এখানে সগর্বে দাঁড়িয়ে আছে রাষ্ট্রপুঞ্জের বিয়াল্লিশ তলা বিরাট প্রাসাদ। আমার হোটেলের জানলা থেকে স্পষ্ট চোখে পড়ে। কাল বিকেলে এক পশলা বৃষ্টি এসে সিক্ত করেছিল ইষ্ট সাইডের পথ। গোলাপ উদ্যানের ঘাসগুলি ভেজা রয়েছে। অ্যাসফাল্টের বাঁধানো পথে আমি একাই হাঁটছিলাম। আসন্ন পরীক্ষার চিন্তায় মনটা আমার ভারাক্রান্ত হয়ে আছে।

চমক ভাঙলো একটি মেয়ের কণ্ঠস্বরে। তাকিয়ে দেখলাম, মেয়েটি আমার চোখের দিকে অবাক হয়ে দেখছে। পরনে তার সিনথেটিক ফাইবারের স্কার্ট, লম্বা হিল দেওয়া প্ল্যাটফরম জুতো। স্কার্টের ওপর হালকা হলুদ টপ, কানে ঝুলছে বড় মুক্তোর দুল। একহাতে একটি হাড়ের বালা, অন্য হাতের মনিবন্ধে হালকা ঘড়ি।

মেয়েটিকে দেখে মনে হয় একে যেন আমি আগে অন্য কোথায় দেখেছি। কোথায়? হয়তো টিউব রেলের কোন ষ্টেশনে অথবা পথ চলতি কাফে কিংবা হাইওয়ের হোটেলে।

এমনও হতে পারে যে তাকে আমি দেখেছি আমার অন্য কোন জন্মে।

তখন ঝকঝকে সকাল। মেঘ মুক্তো আকাশে সূর্যের উজ্জ্বল রৌদ্র। তবুও মেয়েটি তার চাউনির মধ্যে কি এক অজ্ঞাত তন্ময়তা এনে বলে—তোমার নাম টমাস, তাইনা? তুমি সমাজ তত্ত্ব নিয়ে পড়াশুনা করছ। আমি হলাম অ্যানা, আমি থাকি শহরের উপকণ্ঠে। তুমি কি আজ রাত আটটায় আমার ফ্ল্যাটে আসতে পারবে?

পথ চলছি একটি অজানা মেয়ের এমন অবারিত আমন্ত্রণে আমি অবাক হয়ে পেলাম।

যদিও পুরুষ হিসেবে আমি বিশ্বাস করি যে চরিত্র হল কাঁচের গ্লাস এবং উদ্দাম যৌবনের প্রতি এই আমেরিকাতে থাকতে থাকতে একের পর এক অনেক রমণীর সাহচর্যে এসেছি। আমার মত অনেকেই পথ সঙ্গিনী থেকে হয়েছে আমার শয্যা সঙ্গিনী। কিন্তু তারা কেউ আমার বুক ভরা জ্বালা আর অতৃপ্ত কামনার আগুন মেটাতে পারেনি। প্রতিটি সহবাসের সময় অনিবার্যভাবে আমার মনে পড়েছে দূর অতীতের একটি রমণীকে, সে বিবস্ত্র স্মৃতির সামনে উলঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তাকে দেখে আমি ভয় পেয়েছি, ভীষণ ভয়।

তার নাম আমি ভুলে গেছি, অথচ সে ছিল আমার যৌবনের প্রথম উপহার। আজও প্রতিটি মিলন লগ্নে মনে পড়ে তার নীলাভ চোখের লাস্য, তার আগুন ছড়ানো বিহবল দেহ মন্থন বার বার আক্রান্ত করে আমাকে।

কিন্তু অ্যানার কণ্ঠস্বরে মেশানো ছিল কি এক অজানা আন্তরিকতা। আমি তার ডাকে সাড়া না দিয়ে পারলাম না।

মনে হল সে আমার ক্লান্ত মনকে শ্রান্তি দেবে। ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে ছোট্ট কার্ড বের করে আমার হাতে তুলে দিল অ্যানা। তারপর শান্ত স্বরে বলল, আজ রাত আটটায় আমার ফ্ল্যাটে এলে তুমি অনেক অজানা অভিজ্ঞতার স্বাদ পাবে।

অ্যানাকে ধন্যবাদ দেব বলে হাত তুলতে গিয়ে দেখি সে মিশে গেছে জন অরণ্যে।

সারাদিনটি বিশ্রী ভাবে কেটে গেল এখানে ওখানে। তারপর ঠিক রাত আটটাতে পৌঁছে গেলাম ৪২তম স্ট্রীট এবং থার্ড অ্যাভিনিউর সংযোগস্থলে অবস্থিত টিউডর সিটিতে। নম্বর খুঁজে খুঁজে অ্যানার ফ্ল্যাট বের করতে বেশী সময় লাগল না। একটি আকাশ ছোঁয়া অট্টালিকার দোতলাতে তার আস্তানা।

নানা কথা ভাবতে ভাবতে আচ্ছন্নের মত কলিং বেলে আঙুল ছোঁয়াতেই বেজে ওঠে সুমিস্ট কণ্ঠস্বর। তারপর মুহূর্তের মধ্যে আমার সামনে এসে দাঁড়ায় সেই অপরিচিতা অথচ অতি পরিচিতা মেয়েটি।

এই মুহূর্তে সে পড়েছে পাতলা ফিনফিনে একটি রাত্রিবাস। চোখের কোনে কাজল দিয়েছে হালকা করে। তার বেশরম রাত পোষাকের আড়াল থেকে চোখের সামনে ভেসে ওঠে মৃণাল বাহু, রঞ্জিত নাভি এবং পরিপূর্ণ বুকের আভাস। সন্ধ্যার বাতাসে সুগন্ধিত চুলের সৌরভ ছড়িয়ে অ্যানা আমাকে আমন্ত্রণ করল ভেতরে আসবার জন্যে।

তাকে নিঃশব্দে অনুসরণ করে আমি পৌঁছে গেলাম তার বেডরুমে। সেখানে ঢুকেই আমার সুন্দর স্বপ্নটা টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে গেল যখন আমি এক অস্বস্তিকর পরিবেশের সামনে দাঁড়ালাম। অ্যানার শোবার ঘরটি আকারে বেশ বড়, আলো বিহীন। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য হলো তার ঘরের চারপাশে ছাদ থেকে ঝুলন্ত ঐসব কঙ্কাল গুলো।

—একি অ্যানা ?

আমার প্রশ্ন শুনে বাচ্চা মেয়ের মতো খিলখিলিয়ে হেসে উঠে অ্যানা জবাব দেয়—ও কিছু নয়, ও হল আমার খেয়াল মাত্র।

—তার মানে ?

—মানে সখ, অনেকে ফুলগাছ পোঁতে, কেউ আবার দেশভ্রমণ করে। আমার শখ হল মৃত মানুষের কঙ্কাল কিনে শোবার ঘরে সাজিয়ে রাখা। এর জন্যে প্রচুর টাকা খরচ করি।

এই কথাটি বলার সময় অ্যানার চোখে মুখে ফুটে উঠেছে কি এক অভিব্যক্তি। আমার মনে হয় সে যেন টিউডোর হোটেল থেকে ভেসে চলেছে অন্য কোন অন্ধকারময় জগতে যেখানে পার্থিব পৃথিবীর মানুষ যেতে পারে না।

—ছাখো টমাস, এইসব কঙ্কালরা আমার বন্ধুর মত। গভীর রাত্রে এদের সঙ্গে আমি আনমনে কথা বলি। দেখবে, দেখবে তুমি আমার অদ্ভুত যাতুঘরের কঙ্কালদের ?

আমার উত্তরের অপেক্ষা না করে অ্যানা এক কোনে পড়ে থাকা একটি সরু লাঠি নিয়ে আঘাত করলে শূন্যে ঘূর্ণমান একটি কঙ্কালকে। সঙ্গে সঙ্গে ঝুরঝুর করে ছড়িয়ে পড়ে হাড়ের গুঁড়ো। সে বলে—এটি মেরিয়া নামে এক মেয়ের কঙ্কাল, আজ থেকে প্রায় একশ বছর আগে ইংলণ্ডের মানুষ যাকে ডাইনী সন্দেহে হত্যা করেছিল। লকলকে আগুনের আক্রোশে পুড়ে ছাই হয়ে যায় অসামান্য রূপবতী মেরিয়ার দেহ।

........তখন তার বয়স ছিল মাত্র কুড়ি বছর। আমি কোন স্তব্ধ রাতে মেরিয়ার কঙ্কালের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করি—তোমার দগ্ধ মৃত্যুর যন্ত্রণার কথা শোনাবে আমায় ?

আমি অভিভূতের মত শুনতে লাগলাম। এ জাতীয় ভৌতিক পরিবেশের সামনে দাঁড়িয়ে রহস্যময়ী তরুণীর কথা শোনার অভিজ্ঞতা আমার জীবনে এই প্রথম।

—আর এই যেটা দেখছ, দেখ, এটা হল ইরাকের এক নগর বধূর। নাম ছিল তার সেইবা। সে ছিল কামনার আগুন।

জানলা দিয়ে ছুটে আসা এক ঝলক দমকা বাতাসে সেইবার কঙ্কাল ঘুরে গেল। চকিতে আমার চোখ পড়ল টিউডর পাহাড়ের দিকে। এই ভরা সন্ধ্যায় কৃত্রিম আলো যেন বিশীর্ণ মানুষের মত রুগ্ন।

—এ পাশে রয়েছে মিডিলসেক্স রাজপরিবারের কলঙ্কিতা গৃহবধু। আগাথার ফসিল। যে আগাথা দেহের ক্ষুধা মেটাতে প্রাসাদ ছেড়ে চলে যেত।

আমার মনে হঠাৎ এসে জমা হয় হাজার বছরের সঞ্চিত ভীতি বিহ্বলতা। মনে হয় আমি যেন শয়তানের হাত ধরে নরকের সন্ধানে চলেছি।

এ কোন নরক? একি সেই মহাকবি দান্তে বর্ণিত অন্ধকার জগত? না কি মিলটনের হারিয়ে যাওয়া স্বর্গের কাতর বিলাপ?

.......মনে হয়; মনে হয় আমার; টিউডর হোটেলের কক্ষ থেকে আমার আত্মা এখন চলেছে কোন আজানা প্রাসাদে। আকাশে ম্লান সূর্যের অভিশপ্ত আলো। সমস্ত পরিবেশকে গ্রাস করেছে তন্ময়তা। এই শেষ বৈকালিক আলোতে পাম আর চেরী ফলের গাছগুলোতে মধ্য রাতে তুষারের মত ঝরছে বিনম্র আলপনা।

তুষার ছাওয়া উপত্যকা পার হয়ে অরণ্য হারিয়ে গেছে কোন অসীমে। যেখানে সবুজ ঘাস আর রুক্ষ পাহাড় পরস্পরের কপালে এঁকেছে চুম্বন, সেখানে বিসর্পিল পথে হাঁটছি আমি।

আর আমার পেছনে হাওয়ার মধ্যে ভর রেখে উড়তে উড়তে এগিয়ে আসছে সদ্য পরিচিতা অ্যানা।

শুধু কি অ্যানা? না, তার সঙ্গ নিয়েছে অসংখ্য মৃত কঙ্কালের মিছিল, আছে ডাইনী মেরীয়া, নন্দিনী সেইবা, কলঙ্কিতা আগাথা।

প্রকৃতি কিন্তু এই ভৌতিক অস্থিরতার প্রতি উদাসীন। পাহাড়ী চূড়ান্ত সূর্যাস্তের শেষ রঙ দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। হাঁটতে হাঁটতে

পার হয়ে যাই গাছের নীচে ঝরে পড়া পাপড়িদের, বিলাপ মধুর বার্চের নিকুঞ্জ আর সবুজ পত্রালির অনুপম পাহাড়।

ক্রমশঃ এগিয়ে আসে সন্ধ্যের অন্ধকার, গোধুলির শেষে আলোটুকু বুঝি নিভে যায়। এবং এসে গ্রাস করে গাঢ় কুয়াশার ঘন আচ্ছাদন। দেওদার অরণ্যের মধ্যে ক্লান্ত পায়ে হাঁটতে হাঁটতে আমার মনে পড়ে যায় ঐ সব ছুটন্ত কঙ্কালের কথা।

অপস্রিয়মান বাতাসের মধ্যে ভাসতে থাকে শঙ্কাতুর অ্যানার কণ্ঠস্বর। সে যেন আমাকে সাবধান করে দিয়ে বলে—টমাস, আর যেও না, ঐ পাহাড়ে বাস করে হিংস্র কুকুরের দল।

সঙ্গে সঙ্গে বেলা শেষের শ্রান্ত আলোয় জমাট একরাশ তুষার মেঘের মত উড়ে আসে অপার্থিব শীতল অনুভূতি। সেটা আমাকে গ্রাস করার সঙ্গে সঙ্গে টিউডর হোটেলের রহস্যময় ঘরে মৃদু আলো জ্বলে ওঠে। এবং সারামুখে লালসা এনে অ্যানা তার ভরন্ত দেহ বেঁকিয়ে আদুরে গলাতে আবদার করে—আজ সারা রাত তুমি এখানে থাকবে।

তারপর নিমেষে সে ওপরের হালকা হলুদ টপ খুলে নিজেকে সে আরো মসৃণ ভাবে উন্মোচিতা করে দিল। তার অপূর্ব সুন্দর দেহের প্রতিটি অংশ এখন আমার নিঃশ্বাস স্পর্শ পেতে পারে।

এমন অবস্থায় অন্য যে কোন মেয়েকে আমি উপহার দিতাম আমার সুঠাম শরীরের উষ্ণ আলিঙ্গন। কিন্তু ভৌতিক কঙ্কালের পটভূমিতে সহবাস শব্দটাকে কেমন যেন মূল্যহীন বলে মনে হয়।

চিবুকে বন্য কুঠারের চিহ্ন নিয়ে মৃত্যু, শুধু মৃত্যু এখানে এঁকেছে কালো অক্ষরে প্রতিলিপি।

খোলা জানলা পথে শয়তান শীত লাফিয়ে এসে আঁকড়ে ধরে দেহ। রাত পোষাকের চেনে হাত রেখে ধীরে ধীরে নগ্ন হচ্ছে অ্যানা। আমি এই অবস্থায় তার দিকে আবার তাকাই। অসম্ভব লোভনীয় তার দুটি পাতলা রসালো ঠোঁটে চুম্বন এঁকে

দেবার সঙ্গে সঙ্গে যেন রাত্রির অন্ধকার বিদির্ণ করে পাহাড়ী কুকুরের ক্রুদ্ধ জান্তব চীৎকার শোনা যায়।

মনে হয় ঐ সব রক্ত পিয়াসী হিংস্র শয়তানদের দল বাঁধন ছিঁড়ে ছুটে আসবে। তারপর তাদের তীক্ষ্ণ দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দেবে আমার লোভী দেহটা।

সঙ্কীর্ণ গিরিপথের দুধারে আছড়ে পড়েছে ঝাঁকড়া গাছের সারি, বাতাসের দুরন্ত গর্জনের মধ্যে থেকে শোনা যাচ্ছে সুদূর উপত্যকার ওপার থেকে ভেসে আসা অজস্র নেকড়ের কর্কশ চীৎকার।

তারপর সম্পূর্ণ নগ্না হয়ে অ্যানা আমাকে জড়িয়ে ধরল।

মনে হল আমার দেবদারু অরণ্য ঘেরা পাহাড়ী চুড়ায় কালো মেঘের ফাঁকে কৃষ্ণা তৃতীয়ার ভীরু চাঁদ উঠেছে। কেননা তখন টিউডর সিটির এই হোটেলে আলো নেভানো বেডরুমে এসে পড়েছে পথের ধারের নিয়ন বিজ্ঞাপনের রক্ত-লাল দীপ।

তাই একবার উদ্ভাস হয় অ্যানার দেহ। পরক্ষণে আবার ছেয়ে যায় অন্ধকার।

শুরু হল শরীরের সেই পুরানো খেলা জিভের মধ্যে জিভ রেখে নিবিড়তম চুম্বনের মুহূর্তে আবার চোখের সামনে ভেসে ওঠে মৃত জ্যোৎস্নায় হিংস্র নেকড়ের দল। তাদের ঝকঝকে সাদা দাঁতে ঝাঁকড়া চুলে এবং লকলকে জিভে ঝরছে শুধু ঘৃণা আর ঘৃণা।

অ্যানা তখন আমাকে অজস্র আদর দিতে দিতে কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলছে—আমাকে তুমি মুক্ত কর। তোমার শরীরের মধ্যে মাথা রেখে আমি ঘুমোতে চাই।

অন্ধকারে আগাথার কঙ্কাল বুঝি আচমকা হেসে উঠে। সেইবার হাড়ের মিছিল শব্দে তোলে বাতাসে এবং সতৃপ্ত বাসনা নিয়ে দগ্ধ-মৃতা মানবী ডাকিনী মেরিয়া যেন নেমে আসে সঙ্গমে মত্ত দুই মানব-মানবী উলঙ্গ দেহে।

পথটা ফুরিয়ে গেল। ম্লান জোৎস্নায় আমি দেখতে পেলাম হাজার

বছরের একটা পুরোনো প্রাসাদের সামনে এসে দাঁড়িয়ে। তারপর অ্যানার শরীরের মধ্যে মুখ রেখে নিয়ন আলোর চকিত উদ্ভাসকে চোখের সামনে ধরে কেটে যায় আমার অভিশপ্ত ২১শে ফেব্রুয়ারীর রাতটি।

বাইশে ফেব্রুয়ারী। ১৯৭৭

আজ সারাদিন যদিও আমি খেয়াল খুশিমত ভ্রমণ করেছি নিউইয়র্ক শহরের এখানে ওখানে, কিন্তু সর্বক্ষণ আমার মনের মধ্যে বৃষ্টিপাতের মত ঝরেছে শুধু সত্ত সমাপ্ত ভয়ার্ত সহবাসের স্মৃতি।

চারিপাশে মৃত মানুষের মিছিল নিয়ে এই প্রথম আমার নিশি-যাপন। শুধু কি তাই? মনের মধ্যে গর্জন তুলছিল অনন্ত নিশি-থীনির সন্তানরা। তাই অজস্র ভয়ের মধ্যেও ঐ রাতটি আমি ভুলতে পারব না।

কিন্তু আজ আবার আমি এসে হাজির হয়েছি টিউডর সিটির সেই হোটেলে। গতকালের মত অজ্ঞাত অনুভূতিতে মন যদিও ভরে উঠছে না কিন্তু অ্যানার উত্তপ্ত আলিঙ্গন পাবার জন্য তৃষ্ণা আমার বেড়েই চলেছে।

আজ অ্যানা পড়েছে রক্তের চেয়ে লাল গাউন। ঠোঁটে তার টুকটুকে লাল ঠোঁট—রাঙানিয়া।

তবু তাকে মনে হয় সে যেন রক্ত আগুনে ভরা যৌবনা রমণী নয়। সে হল সমাধি ক্ষেত্রের নীচে শায়িত এক রক্ত পিয়াসী।

অ্যানা যখন তার ঝকঝকে দাঁত মেলে ধরলো অনুগত হাসির চিহ্ন, তখন আমার মনে হল রক্তাভ ঠোঁটের ওপর বুঝি এসে পড়েছে তীব্রতম পিপাসার ছাপ।

আমার এইসব অবাস্তব অনুভূতিগুলোর কোন প্রত্যক্ষ কারণ খুঁজে পেলাম না। আজও একই রকম আদিম লিপ্সা নিয়ে নিজেকে ধীরে ধীরে অনাবৃতা করতে থাকে অ্যানা। এবং গত রাতের মত আমার মনে পড়েসেই নিঃসঙ্গ উপত্যকার ধূসর চিত্রাবলি। সীমাহীন

সুবর্ণ সমুদ্রের ফাঁকে চোখে পড়ছে গভীর গিরিখাদ আর আঁকাবাঁকা রুপোলী নদীর রেখা।

ঐ পথ কোথায় চলে গেছে সেটা আমার জানা নেই। নিয়ম মত আলোটা নিভে গেল। এক লাফে গভীর নিশীথ এসে গ্রাস করল আমার সত্তাকে।

টিউডর হোটেলের এই লোভনীয় বেডরুমে প্রবাহিত হল আদিগন্ত বিশারী পর্বতের স্রোতধারা। শঙ্কা বিজরিত অরণ্যানীর সীমাহীন ঐশ্বর্য দাঁড়ালো চোখের সামনে।

মনে হয় আমি যেন বন্দী, অসহায়। নিঝুম নিস্তব্ধতার মধ্যে শুধু শোনা যায় অ্যানার তপ্ত নিঃশ্বাসের শব্দ। তার প্রবলতম শরীর আকাঙ্খার প্রত্যুত্তরে আমার স্নায়ুপুঞ্জ ক্রমেই শিথিল হয়ে আসে।

শূন্যে ঝুলিয়ে রাখা কঙ্কালগুলি বুঝি চোরা পায়ে খাড়াই দেওয়াল বেয়ে সন্তপর্ণে নেমে আসছে পার্থিব সুখের দ্বীপে।

ঐ তো, মেরিয়া। মৃত্যুর প্রাক মুহূর্তে তার পরণে রয়েছে কালো পা ঢাকা পোষাক। এ হলো সেইবা রঙিন ঘাঘরা ঢাকা কুহকিনী মূর্তি। জড়ির চুমকি বসানো গাউন পরিহিতা আগাথাকে চিনতেও ভুল হল না।

প্রথমে মনে হয় এ যেন কল্পনা। তারপর জ্যোৎস্নার সমুদ্র পার হয়ে নেমে আসে সেই তিন ডাকিনী। একদা যারা ম্যাকবেথের কানে কানে শুনিয়ে ছিল সেই অনুনাসিক স্বরের আর্তনাদ—

When shall we three meet again
In thunder lightning or in rain ?

আকাশে এখন কি নেমেছে ঝড় ? অমানুষিক ভয়, দুঃসহ মানসিক যাতনা আতঙ্কে আচ্ছন্ন হয়ে যায় আমার বিধ্বস্ত চিন্তাশক্তি।

তারপর অ্যানার কোমল তনুবাহারের মধ্যে নিজেকে নিঃশেষে সমর্পিত করতে করতে আমার অবচেতন মনের গভীর ছায়াছবির মত এসে দাঁড়ায় সেই অজানা উপত্যকা।

সাইপ্রাস অরণ্যের মাথার ওপর বাসন্তী রঙের বিশীর্ণ চাঁদ সকরুণ ভাবে তাকিয়ে আছে। হিমেল নির্জনতায় কাঁপছে আমার বুক, আকণ্ঠ পিপাসা এসে গ্রাস করছে আমার অনুভূতি।

দূর বিস্তৃত অরণ্যের মাঝে নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে থাকা সেই ভাঙা-চোরা প্রাসাদের সামনে এসে আমার মনে হল কোন বিস্মৃত অতীতে হয়তো এখানে এসে দাঁড়িয়েছিল দুঃসাহসী এক প্রেমিক পুরুষ।

চন্দ্রালোকিত মধ্য রাতের বাতাসকে সাক্ষী রেখে সে চীৎকার করে বলছিল—

Is there anybody there?

কেউ তার জবাব দেয় নি, শুধু ঘুম ভাঙা বাদুরের দল উড়েছিল আকাশে, ভৌতিক শ্রোতারা শুনেছিল অঙ্গীকারের কণ্ঠস্বর। তারপর অপস্রিয়মান ঘোড়ার খুরের শব্দের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছিল সেই নিশি রাতের আগন্তুক।

কিন্তু হাজার বছরের জীর্ণ লৌহ কপাটের অন্তরালে ধুলিধূসর আবলুষ কাঠের পালঙ্কে নিদ্রারতা সুন্দরী প্রণয়ী কি শুনতে পায়নি তার প্রিয়তমের কণ্ঠস্বর?

মনে হয়, জ্যোৎস্না প্লাবিত এই অরণ্য, বাইরের সীমাহীন সবুজ প্রকৃতি বুঝি আমার রিক্ত মনে কোমল পরশ দেবে।

অ্যানা কি ঘুমিয়ে পড়েছে?

নিঃশ্বাসের তরঙ্গে আলোকিত হচ্ছে তার ভরাট দুটি বুক। ঠোঁটের কোনে লেগে আছে তৃপ্তির হাসি। বোকা মেয়ে, শরীরের কামনা মিটে গেলে আর কিছুই থাকে না গ্রহণ করার।

আমি নীরবে তার রক্তাভ ওষ্ঠাধরে চুম্বন এঁকে দি, তারপর মনে মনে বলি—তুমি এখন ঘুমোও অ্যানা, তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে কাল সকালে।

নিয়নের আলোয় দেখতে পেলাম সেই গা ছম ছম দৃশ্যটা। তিনটি রূপসী তরুণী ছায়ার মধ্যে ভাসতে ভাসতে হাজির হয়েছে আমার

সামনে। ওদের দুজনের রঙ সাদা, একজন একটু কালো। ফিকে হলুদ জ্যোৎস্নায় যেন ঝিকিয়ে ওঠে ওদের দেহ।

আমি চিনি, ওদের চিনি, ওরা আমার মৃত আত্মার প্রণয়ী।

ওদের একজন মেরিয়া, যার আশ্চর্য রূপসী মুখের সঙ্গে মানান সই গুচ্ছ গুচ্ছ সোনালী চুল আমাকে স্মরণ করাচ্ছে তার দুর্ভাগ্যের কথা। আগাথার মুখে আভিজাত্যের আভাস, তীক্ষ্ম নাক, মর্মভেদী চোখ, রক্তাভ এবং বিনম্র। অন্যজন সেইবা, তার আকাশী রঙের স্বচ্ছ আয়ত চোখে কামনার ছায়া কাঁপে।

তিনজনের দাঁত অপূর্ব সাদা, কামনা মদির লীলায়িত ছন্দময় আবর্তে ওদের যৌবন দীপ্তা পেলব শরীরগুলো আমার মনে জাগিয়ে তুলেছে বীভৎস কাম এবং ভয়াল কামনা।

আরক্ত ঠোঁটের চুম্বন অভিলাসে আমি হলাম চঞ্চল। সবার আগে এগিয়ে এল মেরিয়া। যাকে ডাইনী সন্দেহে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছিল।

রূপোলি ঝরণার মত বাজতে থাকে তার হাসির শব্দ। ছন্দিল পদক্ষেপে মেরিয়া এসে আমার ওপর ঝুঁকে দাঁড়ালো। আমি সারা-দেহে অনুভব করলাম অনাস্বাদিত স্পন্দন।

তারপর সে এসে তার লালাভ ঠোঁট দুটি ছোঁয়াল আমার গালে, প্রতিটি শিরাতে উপশিরাতে প্রবাহিত হল রক্ত স্রোত। আবেশে আমার চোখ বুজে আসে, অর্ধ নিমীলিত পল্লবের নীচে আমি দেখতে পেলাম মেরিয়া বিছানার ওপর হাঁটু মুড়ে বসে তার দুটি শঙ্খ কোমল পেলব বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরেছে আমার গলা।

তারপর অনিবার্য পরিণতিকে দ্রুততর করতে নেমে আসে ওর দুটি ঠোঁট, পশুর মত মত্ত মদির আক্রোশে আমার ঠোঁট দুটো নিয়ে খেলাতে মেতে ওঠে মেরিয়া।

তারপর.......রাতের বয়স বাড়তে থাকে, মেরিয়ার আগ্রাসী ঠোঁট আমার ঠোঁট থেকে পিছলে চিবুক বেয়ে নেমে এল গলার একপাশে।

গলাটা যেন হঠাৎ ঝলসে গেল। বিস্ময়ে আলোড়িত হতে হতে আমি অনুভব করলাম ওর তীক্ষ্ম ধারালো দাঁত দুটি আমার মধ্যে অনুপ্রবেশ করছে।

দেহের সমস্ত রক্ত এসে জমা হয় কণ্ঠনালীতে। ক্লান্ত অবসাদে চোখের পাতা বন্ধ হতে চায়। তারপর সঞ্চালিত বিদ্যুতের মত কেঁপে কেঁপে উঠে স্থির হয়ে যায় আমার সত্তা।

বাকী রাতটুকু আমার কোন জ্ঞান ছিল না।

শুধু অবচেতনের মধ্যে ভাসছে ডাইনী মেরিয়ার নিঝুম কণ্ঠস্বর —শোন টমাস, আমি রক্ত পান করতে ভালবাসি। আমার দেহকে তোমরা প্রজ্বলিত আগুনে দগ্ধ করেছো, কিন্তু অভিশপ্ত আত্মাকে বিলুপ্ত করতে পারোনি। তাই এখনো আমি চোরের মত প্রবেশ করি তোমাদের দেহে, রক্তপানে নিবৃত্ত করি আমার আকণ্ঠ পিপাসা।

........যদি পার, স্কটল্যাণ্ডের সীমান্তে কুয়াশাচ্ছন্ন ডাইনী উপত্যকার পিছল ঘাসের তলদেশে শায়িতা আমার ভস্ম অবশেষ ভাসিয়ে দিও টেমসের জলে। তাহলে হয়তো আমি মুক্তি পাব।

প্রায় শেষে হয়ে আসা রাতে মেরিয়া যেন আমাকে ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। তার চোখে ফুটেছে নিবিড় তৃপ্তি। সূর্য ওঠার আগে তাকে ফিরে যেতে হবে হাড়ের খাঁচাতে।

তখনো মেটেনি তার তৃষ্ণা। তাই অত্যন্ত মসৃণ দুটি ঠোঁট শেষ বারের মত চুম্বন করে শুষে নিতে চায় আমার উষ্ণতা। বুভুক্ষু ডাকিনীর রক্তাভ দুটি চোখ বুঝি অন্ধকারের অতল অন্ধকার থেকে ঠিকরে বেরিয়ে আসা লেলিহান শিখার মত জ্বলতে থাকে। যখন দুটি নীলাভ জোড়া ভুরু রাগে হতাশায় ধনুক আকৃতি ধারণ করেছে।

বিহ্বল আতঙ্কে আমার চেতনার প্রদীপ নিভে যায়। আমি আচ্ছন্নের মত শুয়ে থাকি।

তেইশে ফেব্রুয়ারী। ১৯৭৭

আজ সারাদিন বেশ শান্তি অনুভব করছি। মনের মধ্যে আবর্তিত হচ্ছে গত দু রাতের স্মৃতি। প্রথম রাতে আমি ছিলাম রহস্য ভরা শরীর অন্বেষণের অনাস্বাদিত আনন্দে মাতাল। দ্বিতীয় রাতে আমার মুহ্যমান সত্তার সামনে সেই ভয়ঙ্কর রূপসী তরুণী এসে দাঁড়িয়েছে তার হিংস্র অভিলাষ নিয়ে। জ্যোৎস্না আলোকিত নির্জন ঘরে সে পান করেছে আমার তাজা রক্ত।

আজ সারা দুপুর নিজের ফ্ল্যাটের বিছানায় শুয়ে দুঃস্বপ্ন বিহীন গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে গেলাম। ক্লান্ত বিষাদ পরিপূর্ণ হল গভীর প্রশান্তিতে। আজ ভেবেছিলাম কিছুতেই ঐ কুহক কন্যার আকর্ষণে সারা দেব না।

ধীরে ধীরে ইস্ট নদীর তীরে অস্ত গেল সূর্যটা। আমি অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলাম মসৃণ সবুজ কার্পেটে। ছোট ছোট তরঙ্গ ভরা উদ্বেল নদীটির দিকে তাকিয়ে রাত্রির ঘনীভূত আতঙ্ককে মনে হলো মিথ্যে কল্পনা।

সন্ধ্যে বেলা হাজির হলাম নিউ ইয়র্কের সেক্স মার্কেট টাইম স্কোয়ারে। একটি সিনেমা হলের টিকিট কেটে দেখবো পর্ণো ছবি। মানব মানবীর আদিমতম দৃশ্য দেখতে দেখতে আমার বিহ্বল মন-টাকে আমি ব্যস্ত রাখতে চাই লালসার মধ্যে।

কিন্তু সেই তিন ডাকিনী তাদের উড়ন্ত চুলে বিস্ময় এনে বলে যায় —আজ রাতে আবার দেখা হবে টিউডর সিটির ঐ বেডরুমে।

সিনেমা হলের অন্ধকারের মধ্যে সেই পুরোনো ভয় এসে গ্রাস করল আমাকে। বুকের মধ্যে দুরদুর করে ওঠে। আমি আর বসে থাকতে পারি না। মনে হয় ঐ ডাকিনীরা তাদের রক্তাক্ত হৃদয়ের মধ্যে আমার জন্যে সঞ্চিত রেখেছে সহানুভূতি।

তারপর যে কিভাবে পৌঁছে গেছি অ্যানার সামনে সেটা আমি

বলতে পারবো না। অ্যানার পরণে আজ ঘন কালো রাত পোষাক। খোলা চুলে হাহাকার করে নিশী সঙ্গিনী বাতাস।

অ্যানা আমাকে দেখে অভিমানী মেয়ের মত চাপা কান্নার আবেগে দুকূল ছাপিয়ে বলে—সারাটা দিন তুমি আমাকে ভুলেই ছিলে?

আমার মনে হয় সে যেন তরঙ্গ ক্ষুব্ধ সমুদ্রের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা নির্জন বাতি ঘরের নিঃসঙ্গ ঘণ্টা। গভীর রাতে যখন মাঝ সমুদ্রে ঝড় ওঠে, দুরের সাগরে হারিয়ে যায় যাত্রীবাহী জাহাজ, অনেক অনেক দূর পর্যন্ত শোনা যায় সেই বিষণ্ণ করুণ ঘণ্টাধ্বনি।

মনে পড়ে যায় আমার দূর শৈশবের সমুদ্র ভ্রমণের দৃশ্যাবলী। শুভ্র বসনা কন্যাকুমারিকার মত ফেনিল জলরাশির মধ্যে দাঁড়িয়ে থেকে যখন আমি উপভোগ করতাম বন্দরের মুখর ব্যস্ততা আর দূরের আকাশের নীলিমা।

তারপর এক সমুদ্র বন্দরে আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল তার, যার নাম আমি জানি না, যার সঙ্গে আমি রাত কাটিয়েছি আমার সেই ফেলে আসা দিনের স্তব্ধ বিধুর ছায়াময় মুহূর্তগুলি।

গ্রানাইট পাথরের দেওয়ালকে আঘাত করত তরঙ্গ, সেতুর সামনে লাফিয়ে আসতো জলরাশি। আমি আমার সেই অনামিকার চোখে চোখ রেখে বলতাম—

Who knows but the world may end to-night.

আজ অ্যানার মৃদু সম্ভাষণে সেই পুরোনো দিন যেন জীবন্ত হতে চায়।

যথাসময়ে রাত্রি নামে। এবং প্রাত্যহিক সহবাস শেষ করে ঘুমিয়ে পড়ে অ্যানা। আমার আত্মা অপেক্ষা করতে থাকে সেই চরম মুহূর্তটির।

তারপর ওদের পায়ের আওয়াজ শোনা যায়। সুদূর উপত্যকার কোথা থেকে যেন ভেসে আসে পাহাড়ী কুকুরের রক্ত জল করা আর্তনাদ।

আমার অর্ধ-অবচেতন সত্তার মধ্যে ধীরে ধীরে রূপময় হয়ে ওঠে সেই তিনটি তরুণীর অলৌকিক ছায়ামূর্ত্তি। আতঙ্কে সারা শরীর শিরশির করে ওঠে। খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে দেহের প্রতিটি লোম।

হিমেল নীরবতা এসে গ্রাস করে আমাকে। চোখের সামনে আমি দেখতে পাই মধ্য প্রাচ্যের সেই অসম্ভব যৌবনা অনন্ত পিয়াসী সেইবাকে। কিন্তু তার চোখে সজল রেখা, আলুথালু বেশ, এলো-মেলো শুকনো চুল।

সে আমার পায়ের সামনে শুয়ে ছটফট করে কাতর বিলাপের স্বরে বলতে থাকে—ফিরিয়ে দাও, আমার জীবন আমাকে ফিরিয়ে দাও।

অবরুদ্ধ কান্নায় বুকের ভেতরটা আমার গুমড়ে ওঠে। ঠিক তখনই শুনতে পাওয়া যায় রুক্ষ কর্কশ অলৌকিক কণ্ঠস্বর। অন্ধকারে ধ্বক ধ্বক করে জ্বলে ওঠে হায়নার চোখ।

তারপর ক্রন্দনরতা সেইবা পরিণত হয় রক্ত পিয়াসী রমণীতে। সে এগিয়ে এসে আলিঙ্গন করে আমাকে। উন্মাদিনীর মত আমার ঠোঁটে, কপালে, চিবুকে আঁকতে থাকে অনেক চুম্বন।

দুঃস্বপ্ন জড়ানো যে ভয়টা আমার আত্মাকে গ্রাস করেছিল সেটা নিঃশব্দে খসে যায়। এ পৃথিবী থেকে আমার অস্তিত্বকে চিরতরে লুপ্ত করার যে বাসনা নিয়ে আমি মগ্ন ছিলাম সেটা যায় হারিয়ে।

কেননা এখন আমি মধ্য প্রাচ্যের টাটকা শরীরের সুঘ্রাণ নিতে ব্যস্ত। সঙ্গমের ফাঁকে ফাঁকে ঢল ভেঙে নামা ঝোরার মত হেসে উঠছে সেইবা।

অনুমান করতে আমার কষ্ট হয় না যে একদা তার শরীরী সত্তার জন্যে কত স্বর্ণ চঞ্চু উন্মুখ হয়ে থাকত।

কিন্তু আমাদের শারীরিক মিলনের চরম শিখরে উপনীত হবার সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠনালীর মধ্যে সেই ব্যথাটা জেগে ওঠে। আমি বুঝতে

পারি সেইবার তীক্ষ্ণ দুটি দাঁত দংশন করছে আমার রক্তবাহী নালীকে। তারপর দুইটি কোটরাগত চোখে আকণ্ঠ পিপাসা নিয়ে সে নিঃশেষে পান করছে আমার শরীরের স্বাদ।

মাথা ঝিমঝিম করে। মনে হয় জীবনের শেষ দিন নেমে আসছে।

কখন যে মৃত কঙ্কাল সেইবার পাথরের মত নিথর দুটি চোখের মণিতে লেগেছিল রক্তের ছিটে দাগ; মৃত্যুর মত নিষ্প্রভ ঠোঁটের কোণে জেগেছিল তৃষ্ণা নিবৃত্তির রক্তিম হাসি, আমার ধূসর চেতনাতে তা ধরা পড়েনি।

চব্বিশে ফেব্রুয়ারী ১৯৭৭

আজ সারাটা দিন অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যে কেটে গেল। শরীর বেশ দুর্বল। রক্তক্ষরণে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। যে ভয়টা আমাকে গ্রাস করত অন্ধকারে সেটা এখন সর্বদা মৃত ছায়ার মত আমার সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়।

ইস্ট রিভার সাইড রোড ধরে ঝকঝকে দুপুরে একা পথ হাঁটতে হাঁটতে আমার নাকের মধ্যে প্রবেশ করে বিশ্রী একটা পচা গন্ধ। মনে হয় আমি যেন কোন বিরাট গ্রেভ ইয়ার্ডে পা দিয়েছি। আর খুলে খুলে দেখছি ধুলি ধূসর কফিনগুলো।

আর ভাবছি কোথায় শোয়ান আছে দগ্ধ মেরিয়া এবং মৃতা সেইবার লাস?

পৃথিবীর কোন মানুষ কি আমার এই অকল্পনীয় অনুভূতির কথা শুনলে বিশ্বাস করবে? জানি, তারা বিশ্বাস করবে না।

তারা শুধু ছুঁড়ে দেবে অবিশ্বাসের কালো ধোঁয়া। তাই সেই আজানা আতঙ্কের কথা কাউকে শোনাতে চাই না আমি। আমার আতঙ্ক আমারই থাক। মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে লড়তে মনের অজ্ঞাতসারে আমি যে কখন মৃত্যুকে ভালবেসে ফেলেছি সেটা জানা ছিল না।

মৃত্যু যেন তার বিবর্ণ আবরণের মধ্যে, তার ভৌতিক অবয়বের মধ্যে এবং তার বিলাপ-মুখের কান্নার মধ্যে আমার প্রাণে প্রবাহিত করে অদ্ভুত ভালবাসা, আমি তার সন্ধান পেতে চাই।

আবার নেমে আসে রাত্রি। অভিভূতের মত আমি হেঁটে যাই অ্যানার কাছে। যে অ্যানাকে আমার মনে হয় জীবন আর মৃত্যুর মধ্যে অবস্থিত একটি বিবর্ণ সেতুর মত। তার এক চোখে জীবনের উল্লাস, অন্য চোখে মৃত্যুর ভাস্বরতা।

অ্যানা প্রতিরাতের মত আবার আমাকে ঢেলে দেয় তার সোহাগ,
—আজও সারাদিন তুমি আমাকে ভুলে রইলে ?

আমি জানি, যেদিন আমার শরীরী সত্তার অবসান ঘটবে, সেদিন চির রাত্রি নেমে আসবে চোখে এবং অ্যানার নীড়ে খুঁজে নেব আমার বিশ্রাম।

আবার শুরু হয় চির পরিচিত সেই অর্থহীন সহবাস। কেননা মানবী লালসার সমুদ্রে ডুব দিয়ে দিয়ে আমি ক্লান্ত, আমি চাই কঙ্কালের ভালবাসা।

এবং আমি জানি আজকের মধুর রাতটি চিহ্নিত আগাথার জন্যে।

আগাথা, মিসেস আগাথা ব্যানিষ্টার, মিডলসেক্স রাজ পরিবারের শরীর গরবিনী বধূ আগাথা। যাকে তৃপ্তি দিতে পারে নি কোন পুরুষ, সে কি আমার আলিঙ্গনে তৃপ্ত হবে ?

ক্রমশঃ রাত গভীর হয়। ব্যর্থ হাহাকারের মত কি এক দুর্গম শব্দ বেজে ওঠে স্তব্ধ বাতাসে। তিনটি অপূর্ব রূপবতী কন্যা এসে দাঁড়ায় চোখের সামনে। তাদের সবার আগে দাঁড়িয়ে আছে আগাথা, তার দৃপ্ত ভঙ্গিমাতে কামনাময় নীল রক্তের স্রোত।

বাকী দুজন অদৃশ্য হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আমার অন্তর-আত্মা যেন আতঙ্কে কেঁপে ওঠে।

সোনালী চুলের বন্যা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা আগাথা এক লহমাতে পরিণত হয়েছে লোলতম বৃদ্ধায়। তার কোমল ত্বককে আচ্ছন্না

করেছে কঠিন জরা, চোখের দ্যুতি গেছে হারিয়ে। সেখানে ফুটেছে মৃত্যুলীন আভা।

সেই বয়সিনী রমণী খিলখিলিয়ে হাসতে হাসতে আমার দেহ আকর্ষণ করে বলতে থাকে—দেখতে দেখতে জীবনের অনেকগুলো বছর গেল কেটে। একটির পর একটি পুরুষের দেহ সুখ অন্বেষণ করতে করতে অবশেষে ফুরিয়ে গেল আমার যৌবন। তবু আমি শান্তি পেলাম না।

........মৃত্যুর পরে আমার অতৃপ্ত আত্মা তোমার মত সবল পুরুষদের গ্রাস করে মিটিয়ে নেয় আকণ্ঠ পিপাসা। আজ রাতে তুমি আমার খিদে মিটাবে।

বৃদ্ধা আগাথার দিকে মাত্র একবার তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিলাম।

একি দেখছি আমি ?

বিবর্ণ ঠোঁটের কোল থেকে তাজা রক্তের ধারা চিবুক বেয়ে গড়িয়ে এসেছে গলা অবধি। আমার দিকে তাকিয়ে সে অদ্ভুত কুৎসিত বিদ্রূপের ভঙ্গীতে হেসে ওঠে। অসহ্য ক্রোধ যেন প্রতিফলিত তার সেই হাসিতে।

তারপর অরণ্য আদিম হিংস্রতায় ধ্বক করে জ্বলে ওঠে তার বিবর্ণ মণি। স্মৃতি বিস্মৃতির মধ্যে স্থির হয়ে শুয়ে থাকি আমি। তারপর অভিশপ্ত প্রকোষ্ঠের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হয় অসহায় বন্দী মানুষের আকুল আর্তি।

কামনা পিয়াসী ডাকিনী আগাথা এসে আশ্রয় করে আমাকে। আমার আর মনে কিছু মনে পড়ে না।

আঠাশে ফেব্রুরারী। ১৯৭৭। শেষ রাত।

এমন করে সারাটা দিন এক আজানা আতঙ্কে দংশিত হতে হতে

এবং সারাটা রাত অতৃপ্ত আত্মার শিকার হয়ে মাত্র সাতদিনে আমি পরিণত হয়েছি রক্তহীন রোগীতে।

তবু আমি অ্যানাকে ভুলতে পারিনি। রাত হবার সঙ্গে সঙ্গে হাজির হয়েছি তার বেডরুমে, যেখানে চাবুকের স্বনন তুলে আমার জন্যে অপেক্ষা করতে থাকত আদিম অভিশাপ।

কাল রাতে অ্যানার অপ্রত্যাশিত প্রত্যাখান আমায় আঘাত দিয়েছে। জানি না আমি তাকে সুখী করতে পেরেছি কিনা। হয়তো অশরীরীদের প্রতি আমার আকর্ষণকে সে ভাল চোখে দেখেনি।

কিন্তু গতকাল সার্কাস এ্যাভিনিউ দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে আমি যে দৃশ্য দেখেছিলাম তার কোন যুক্তি আছে কি?

সেই আসন্ন সন্ধ্যায় হঠাৎ আমার সামনে এসে, দাঁড়াল অ্যানা। পরণে তার বৈকালিক ভ্রমণের সৌখিন পোষাক। সে আমার হাত ধরে বলল—চল, রিভার সাইড থেকে ঘুরে আসি।

রাত্রের বিভীষিকাকে ভুলে যাবার চেষ্টা করে আমি তার সঙ্গী হলাম।

রিভার সাইডে পৌঁছে আমরা পাশাপাশি বসলাম একটি কালো গ্রানাইড় পাথরের কৃত্রিম পাহাড়ে। অদূরে বহমান শান্ত নদী ইস্ট। নীচে সুখী মানুষের কাকুলি। দুদিন আগে এই পরিবেশে আমার সঙ্গে তার প্রথম দেখা হয়।

শীষ দিতে দিতে উড়ছিল একটি হলুদ পাখি। আমি তার নাম জানি—লাভ বার্ডস অর্থাৎ ভালবাসার পাখি। সেই নির্জনে শান্ত ছায়ায় বসে অ্যানার উষ্ণ হাতে হাত রেখে আমি বলতে গেলাম—
She walks in beauty like the night!

কিন্তু আমার সচকিত করে অ্যানা জান্তব ক্ষুধা নিয়ে তড়িৎ গতিতে হাতের মুঠোয় পুরলো সেই ছোট্ট পাখিটিকে। তারপর অবিশ্বাস্য তৎপরতায় সেটিকে জীবন্ত খেয়ে ফেললো।

তার সাদা দাঁতের শব্দ আমার কানে গেল। রঞ্জিত পাতলা ঠোঁট ভরে গেল সদ্যমৃত পাখির তাজা রক্তে!

আমার মনে হল অ্যানা ভালবাসাকে নির্মম ভাবে হত্যা করেছে। মনস্তত্বের বইতে আমি এই জাতীয় মানুষের কথা পড়েছি, যাদের বলে আত্মা ভোজনকারী। তারা জীবন্ত প্রাণী খেয়ে সেই জীবনী শক্তিকে নিজের আত্মার মধ্যে সংবাহিত করে।

কিন্তু অ্যানার ক্ষুধাতো শুধু মাত্র পাখিকে ভোজন করে মিটবে না। সে ক্রমশঃ গ্রাস করতে চাইবে আরও বড় প্রাণীকে। অবশেষে হয়ত গ্রাস করবে মানুষকে।

মনের মধ্যে ঝড় ওঠে, রিভার সাইডের শান্ত পরিবেশকে মাতাল করে ছুটে আসে বিক্ষুব্ধ ফেনিল উর্মিমালা।

গ্রানাইড পাথরের বুকে রক্তের দাগ দেখা যায়। আমি অ্যানার সামনে আর থাকতে পারি না। ছুটতে থাকি·· ·····।

আমার ছুটন্ত সত্তার মধ্যে আবার এসে ভিড় করে সেই যন্ত্রণা দগ্ধ ছবিটা।····আমি যেন একলা হাঁটছি উপত্যকা দিয়ে। বিধ্বস্ত প্রাসাদের মাথায় দূরে নিলীম আকাশে জ্যোৎস্নাভরা ভীরু চন্দ্রিমা, সমাধি ভুমিতে ছড়ানো শোকের পাপড়ি স্নাত হচ্ছে বেহিসেবী জ্যোৎস্না ধারায়।

বিবর্ণ ক্লান্তি এসে গ্রাস করছে আমার দেহ, অজানা আশঙ্কা শির শির করছে বুকের মধ্যে; আশে পাশে কোথাও কেউ নেই, সমস্ত পরিবেশ কি ভীষণ নির্জন, মনে হয় যেন আমি একা এখানে অনন্ত প্রহর অতিবাহিত করব।

তারপর আমার তন্দ্রা ভেঙেছে হাসপাতালের শয্যাতে। শুনেছি আমি, আমার ক্লান্ত দেহটা আছড়ে পড়ে শহরের রাজপথে।

কণ্ঠনালীতে অসহ্য যন্ত্রণা, রক্তের লাল দাগ শুকিয়ে কালচে হয়ে গেছে। ভীষণ দুর্বলতা এসে গ্রাস করেছে আমাকে। চোখ বন্ধ করলেই আমি দেখতে পাচ্ছি সেই বিভীষিকা।

আমার ঘুম আসছে না। মাথার মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণা। নিষ্ঠুর এক দুঃস্বপ্নকে সঙ্গে নিয়ে কাটছে আমার নিদ্রাহারা মুহূর্তগুলো।

ডাক্তার রিপোর্ট দিয়েছে যে আমার রক্ত নাকি দূষিত হয়ে গেছে। কোন মানুষের রক্ত এখন আর আমাকে বাঁচাতে পারবে না।

তাহলে? তাহলে কি আমি নীরক্ত শরীর নিয়ে হারিয়ে যাব মৃত্যুর সমুদ্রে?

যন্ত্রণায় ছটফট করতে বুঝি একটু তন্দ্রা এসেছিল আমার চোখে।

সেই তন্দ্রা ভেঙে গেল। নিঃসীম অন্ধকারে দীর্ঘ কালো একটি ছায়ামূর্তি এসে দাঁড়ালো আমার সামনে। মুখ তার ঘষা মোমের মত, দুটি চোখ যেন রক্ত রুবির মত জ্বলছে।

এক পলকে একবার মাত্র দেখা দিয়ে আবার অদৃশ্য হয়ে যায় সেই ছায়া রমণী। মনে হয়, সে যেন অ্যানা, আমার উদাসীনতার প্রতিশোধ নিতে আসছে। অথবা এমন তো হতে পারে যে সে এবার ভালবাসার হলুদ পাখিটির মত গ্রাস করবে আমাকে। কড়মড় করে চিবিয়ে খাবে আমার সমস্ত শরীর, পরিশ্রুত জলের মত পান করবে রক্ত।

তাকে আবার দেখা গেল। বাঁধ ভাঙা কাক জ্যোৎস্নায় চোখে পড়লো তার সিল্যুট ছায়া ছায়া ছবি। সে ধীরে ধীরে এসে দাঁড়ালো আমার সামনে।

আধফোটা পাপড়ির মত ঈষৎ ফাঁক করল তার দুটি ঠোঁট, জড়ানো কণ্ঠে বলল— -আমার দিকে তাকাও, কি, চিনতে পারো?

আমি দেখলাম, কে সে?

সে কি ডাকিনী মেরিয়া? নন্দিনী সেইবা? নাকি কলঙ্কিতা আগাথা?

অথবা বিষ কুহকিনী অ্যানা?

না, কেউ নয়; আমি ফিসফিস করে বললাম—আমি তোমাকে চিনতে পারছি না।

সেই ছায়া রমণী হেসে ওঠে। হাসতে হাসতে বলে—আমি লুসি, এবার তুমি আমায় চিনতে পারবে।

যে লুসি হারিয়ে গেছে চোদ্দ বছরের অতৃপ্ত জীবন নিয়ে এ লুসি সে নয়। এ হল ভরা দেহে টলমল যৌবনের তরঙ্গ বাহিত রূপবতী লুসি। যে লুসি কোনদিন পৃথিবীতে আসবে না।

সেই নিঃসঙ্গ যুবতীর জন্যে আমার অন্তরে সঞ্চারিত হয় গভীর মমত্ববোধ। আমি তাকে আরো কাছে ডাকলাম। শিশির ভেজা ফুলের মত মুখটি তুলে ও আমার দিকে তাকালো।

সেই মুখে প্রতিফলিত নিষাদ এবং বিষণ্ণতা। কিন্তু তার চোখ? সুর্যাস্তের সময় গীর্জার রঙিন চাঁদে যেমন দেখেছি অস্তাচলের বিবর্ণ সূর্যের প্রতিফলন, তার চোখে সেই দূর আকাশের ছায়া।

ভাবলাম, আমার জীবনের সমগ্র খামখেয়ালের মধ্যে, ধারাবাহিক শরীর অন্বেষণের মধ্যে এই প্রথম আমি তৃষিত ঠোঁটে লেহন করবো প্রেমকে।

লুসি যেন এক মুহূর্তে পরিণত হয় শরীর বিহীন মাংস পিণ্ডে, তার ধূসর চোখে মৃত্যুর করাল ছায়া, সারা মুখ খড়ির মত বিবর্ণ পাংশুল। চিবুকের হাড়দুটো ঠিকরে বেরিয়ে এসেছে, শ্বাস নিতেও বুঝি কষ্ট হচ্ছে তার।

এ দৃশ্য চোখে দেখা যায় না।

একটু পরে ক্ষণকালের জন্যে তার চিবুকে আরক্তিম উন্মদনা ফিরে আসে। অতল শান্তি থেকে মুখ ফিরিয়ে সে আমার দিকে তাকায়। তারপর বলে—এসো, তোমাকে আমি আত্মার স্বর্গে নিয়ে যাব।

আমার সমস্ত চেতনার মধ্যে প্রবল যন্ত্রনা হতে থাকে। শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো কে যেন নিংড়ে নিচ্ছে। ক্রমশঃ আমি আত্মার ঘুমন্ত স্তর থেকে অন্য স্তরে হারিয়ে যাচ্ছি।

—আমার মৃত্যু ঘটছে·······

চোখের সামনে আলো। দৃশ্যমান রক্তাক্ত মৃতা কিশোরী লুসির শীর্ণ। মুখ এবং ভয়ার্ত চোখ।

## নীল রাত্রির ত্রাস

বোস্টন বন্দরে নেমে আসছে খাঁ খাঁ রাত। মাটিতে আছড়ে পড়ছে ভরাজল। ফেনিল আবর্ত সৃষ্টি করে আবার হারিয়ে যাচ্ছে।

দূরের জাহাজ নিঃশব্দে আঁকছে আলোকমালা। অন্ধকারে ঘাসের বুকে বসে থাকা বাবরি চুলের ছেলে হাতের তালুতে মেপে নিচ্ছে বান্ধবীর বুকের মাপ।

ঠিক তখন ভাসমান প্রমোদ তরণী "লা ক্লাকা" তে একটি কাঠের কেবিনে টুপ করে নিভে গেল শেষ আলোটি। হুহু করে আঘাত হানছে হিম হাওয়া, ঢুকতে পারছে না।

কিন্তু ভেতরে হীটারের উত্তপ্ত আবেগে পাশাপাশি শুয়ে আছে নববিবাহিত দম্পতি, তাদের নাম রোহন আর নিকিতা। সবেমাত্র বিয়ে হয়েছে, তাই মধুনিশি যাপনের উদ্বেল মুহূর্তে ওরা হয়েছে চঞ্চল।

আটলান্টিক মহাসাগরের অতলান্ত রোমাঞ্চ এসে গ্রাস করছে দুটি শরীর।

অবশেষে ঘুমিয়ে পড়ে ক্লান্ত স্বামী রোহন, আঠারো বছরের লাজুক ছেলে। তার পাশে তপ্ত যৌবন নিকিতা যেন আগ্নেয়গিরির মত। প্রতি রাতের মিলনে তার ভূমিকা হয় প্রধান!

নিকিতার চোখে মুখে জমাট তৃপ্তির আভাস। তার সুন্দর ও মসৃন দেহে মুক্তোর হার আর মুক্তোর দুল। অসম্ভব শ্বেতাঙ্গিনী সে। চোখের তারাতে ফুটেছে আনন্দের ছটা। আলো বিহীন কেবিনে যেন জ্বলে ওঠে মৃদু আলো।

নিকিতার দেহটা ক্রমে পরিণত হচ্ছে বনবেড়ালে। তার হাতে পায়ের আঙ্গুলে বড় বড় নখ, দেহটা ঢেকে গেছে বড়ো বড়ো লোমে।

তার জিভটা তীক্ষ্ণ হয়ে উঠছে, সে মাথা তুলে বসল ঘুমন্ত রোহনের সামনে।

রোহন কপালে তপ্ত নিঃশ্বাসের স্পর্শ পেয়েছে। ঘুমের মধ্যে সদ্য সমাপ্ত শরীর খেলার মধুর স্বপ্ন দেখছিল সে, হঠাৎ ঐ বুনো গন্ধ তাকে আচ্ছন্ন করে দিল। সে চমকে চোখ মেলে তাকাল।

দেখেই প্রচণ্ড ভয়ে চীৎকার করে ওঠে রোহন।

এ কি করে সম্ভব ?

বন্ধ কেবিনে তার পাশে শায়িত ছিল নিকিতা, এখন সেখানে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে বনবেড়াল। রোহনের গলা শুকিয়ে আসছে, চোখ স্থির। সে দরজাতে সজোরে আঘাত করল।

বনবেড়াল যেন অদৃশ্য হল বাতাসে। ঘরের মধ্যে সশব্দে বাজ পড়ে, আগুনে ঝলসে গেল রোহনের দেহ। ঐ বজ্র থেকে সৃষ্ট ঝড় মাতালের মত আলোড়িত করছে কেবিনকে।

রোহন স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারছে না। তার দেহ কাঁপছে, চুল উড়ছে। এই অভাবিত দৃশ্য পরিবর্তনে তার অনুভূতি ভেঙে যাচ্ছে।

আবার চোখের সামনে দাঁড়াল নিকিতা। কিন্তু সেই মোহময়ী মেয়ে নয়, এ হল পিপাসু পিশাচ। বড়ো বড়ো সুঁচালো দাঁত, রক্ত-লাল দুটি ঠোঁট, চোখের দৃষ্টিতে বিষ চাউনি।

—শোনো রোহন, আমি মানবী নই, আমি হলাম প্রেত রমণী।

নিকিতা হাসতে হাসতে বলছে—তোমাকে সেদিন প্রথম দেখি তখনই আমি ভেবেছিলাম যে তোমাকে গ্রাস করতে হবে। তাই শুরু হল আমার মিথ্যে ভালবাসার অভিনয়। একটির পর একটি দিন কেটেছে আর আমি ভেবেছি কবে তোমাকে জীবন্ত ভোজন করবো। তোমার সুস্বাদু হৃদপিণ্ডটাকে উপড়ে ছিঁড়ে ভিজিয়ে রাখব অ্যাল-কোহলে। মাথাটা ঘুরতে থাকবে, সাজানো থাকবে কাঁচের বোতলে।

....আমার ল্যাবরেটারীতে পাশাপাশি বসানো আছে এমন অনেক

যুবকের তাজা কলিজা। তাদের কাছে স্থান পাবে তুমি। তোমাকে আমি মনে রাখবো। চোখের সামনে মাথার পাশে বসানো থাকবে কাঁচের পাত্র।

—নিকিতা, নিকিতা, কি বলছো তুমি ?

রোহন কোনরকমে প্রশ্ন করে। নিকিতা হেসে উঠেছে। বলছে —আমি হলাম প্রেত-পিশাচ। তাই যেকোন রূপ ধারণ করতে পারি। জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রাতে ধূলিকণাতে পরিণত হই, বাদল -সন্ধ্যাতে মিশে যাই ঝড়ের পরিমণ্ডলে। কখনো হই হিংস্র হায়না, আবার হই বুনোবেড়াল। বাতাসে ভাসতে পারি, আকাশে উড়তে পারি। আমার চলাচলে কোন বাধা নেই।

কেবিনে নেমেছে বাদুড়ের ডানাতে অন্ধকার।

বিশ্রী গন্ধ ভাসছে, বুঝি অ-মৃতা আত্মা কাঁদছে সজোরে। করুণ বিলাপ ধ্বনিতে মুখরিত বাতাস।

নিকিতা এবারে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে রোহনের দিকে। রোহন দেয়ালের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দিল।

—নিকি, নিকি, নিকিতা। এক পা এগোলে তোমাকে আমি বুলেট দিয়ে মেরে ফেলবো।

একেবারে শেষ মুহূর্তে যেন অলৌকিক শক্তিতে ভরে ওঠে রোহনের মন। সে দ্রুত পিস্তলটা বের করে উঁচিয়ে ধরল আগুয়ান নিকিতার দিকে।

দুটি উলঙ্গ যুবক-যুবতী পরস্পরের দিকে হিংস্র চোখে দেখছে। অশরীরী নিকিতা সারা দেহে হিল্লোল তুলে প্রবল ভাবে হেসে উঠল। তার হাসির তরঙ্গে থমকে গেল রোহন।

বলল—নিকিতা, এখনো বল তোমার এই ছলনার কারণ কি ? আমার স্বপ্নটাকে এমনভাবে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিও না। নিকিতা, বলো, জবাব দাও।

নিকিতা যেন থেমে গেল, বলল—আমার মনের ওপর এখন আর

কোন দখল নেই। সে অন্যের নির্দেশে চালিত। তার মধ্যে প্রবাহিত ভ্রূণের কান্না। আমি কি করতে পারি রোহন।

রোহন ঠিক বুঝতে পারে না। ঐ নিকিতাকে সে গত ছ'মাস ধরে দেখে আসছে। ওকে হত্যা করতে বুক কাঁপছে তার।

কিন্তু মানুষের কাছে সবচেয়ে দামী হল তাদের নিজের জীবন। একে বাঁচাতে হলে সে সব কাজ করতে পারে। তাই কাঁপল না রোহনের নিশানা! সে নির্ভুল লক্ষ্যে সামনে থেকে দু বার গুলী করল।

আশ্চর্য, নিকির দেহটা স্বচ্ছ আবরণ। গুলী তাকে ভেদ করে চলে গেল। একবিন্দু রক্ত পড়ল না। কোন আর্ত-চীৎকার নেই।

শুধু শ্যাওলা জমা কবরের মধ্যে মৃদু আর্তনাদ শোনা গেল।

বুকের বাঁদিকের হাড়ে ফুটো হয়েছে। লুসি ছটফট করতে থাকে। সে ভৌতিক আর্ত স্বরে চীৎকার করতে করতে বলে—অসহ্য যন্ত্রণা, অসহনীয় ব্যথা, যদি একবার জীবন ফিরে পেতাম। আহা........

ছায়াময় শরীর নিয়ে তার পাশে এসে দাঁড়ায় অ্যানিলিয়া। বলে—আয় আমি তোর ব্যথা ভুলিয়ে দিচ্ছি।

ওদিকে ভাসমান কেবিনের রুদ্ধশ্বাস নাটক তখন চরমে উঠেছে। নিকিতা এবার ক্রুদ্ধ, সে প্রবল হুঙ্কারে কাঁপিয়ে দিচ্ছে বাতাস। তেড়ে আসছে আক্রোশে।

ক্ষণকালের মধ্যে তার হিংস্র নখরে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হল রোহনের তাজা দেহ। রক্তের ধারা ফিনকি দিয়ে ছুটেছে। লকলকে জিভ তুলে বন বেড়ালী নিকিতা সন্তর্পণে তুলে নিল ধারাল চকচকে ছুরিটা।

সেটা বিদ্ধ করল রোহনের বুকে। নিপুণ হাতে কেটে নিল তার হৃদযন্ত্র। তাজা ফুসফুস আর ধমনী। চোখে মুখে ফুটেছে তার বিভৎস রিরংসা।

রোহনের বুকে গভীর রক্তাক্ত ক্ষত। দগদগ করছে হৃদপিণ্ড বিহীন গহ্বর।

রাত্রি এসে জড়িয়ে ধরেছে আকাশ। আটলান্টিকে যেন ঝড় উঠেছে। আলোড়িত হচ্ছে কেবিন ঘর।

অনেকদিন বাদে মেডিক্যাল স্টুডেন্ট নিকিতার ল্যাবরেটারীতে কাঁচের জারে অ্যালকোহলে ডোবানো রোহনের হৃদযন্ত্র দেখা যাবে। ওটা প্লাজমার মধ্যে ভাসতে থাকবে।

ওর মধ্যে ঘুরতে থাকবে অনন্তকালের আশা। মৃত আত্মার অবগুন্ঠিত আশা আর বিদীর্ণ কামনাকে বুকে নিয়ে নিঃশ্বাস বিহীন সেলে বন্দী থাকবে রোহনের হৃদপিণ্ড।

তার পাশে শোয়ানো থাকবে নিকিতার বেড়াল দেহ।

অ্যান্নুবিসের বেঁকানো ঠোঁটে অদ্ভুত হাসি ফুটবে।

## বাতাসে বিষাক্ত মৃত্যু

অ্যান্নুবিসের মূর্তির নীচে বসে হেনরীর মনে হল তার প্রেত তত্ত্বের গবেষণা একেবারে ব্যর্থ হয়ে গেছে। মৃত আত্মার মধ্যে ব্যাপৃত থেকে সে জীবনের মুহূর্তগুলিকে উপেক্ষা করেছে। সে কখনো দেখেনি বৃষ্টিপাত, রমণীর প্রেমকে করেছে উপেক্ষা।

তার কাছে পৃথিবীর রঙ ছিল রহস্য ঢাকা। সে যৌবনকে ভেবেছে প্রেতায়িত আত্মার ক্রন্দন। কিন্তু আজ যেন সেই ধারণাটা বদলে যাচ্ছে। তার মনে হচ্ছে অভিশপ্ত আত্মার কবলে মৃত না হয়েও বাঁচা যায়।

জীবনের অর্থ আরোও মহৎ, আরোও ব্যাপক। সে বিস্তৃত নক্ষত্র লোকের বিরাটত্বে, তার জন্ম তারার দেশে।

ভুল করেছি, ভুল। আমি যে বোকার মত সারাটি জীবন শুধু কাটিয়ে গেলাম মৃত আত্মার অনুসন্ধানে। স্বেচ্ছায় জীবনের সুখকে করেছি বন্দী। অনুভূতিকে হত্যা করেছি।

…বিনিময়ে কি পেলাম আমি? হাজার বছরের অন্ধকার বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছো তুমি শয়তানী শৃগাল অ্যান্নুবিস। জবাব দিতে পারবে আমার প্রশ্নের? কি দিয়েছো আমাকে? পেয়েছি কি উত্তর? আমার সাধনা কি শেষ হয়েছে?

অ্যান্নুবিসের পাথরের মূর্তি নির্বিকার। শুধু রক্ত ঝরছে চোখে।

হেনরী এবার তাকাল অমঙ্গলের প্রতীক আমন রার দিকে। বলল থুতু ছিটিয়ে—তুমি তো তাজা মানুষের উষ্ণ রক্ত পান করো। বলতে পারো জীবনব্যাপী অন্বেষণে কি মিলেছে আমার? আজও কি জেনেছি আত্মার স্বরূপ? মানুষ কেন জন্ম নেয়, কেন মরে যায়, সে খবর আজো আমার অজানা।

হেনরীর চোখ পড়েছে থীবসের আত্মগোপনকারী দেবতা আমেনের দিকে। ভেড়ার মাথা যুক্ত ঐ দেবতার নির্বাক চোখে ঝরছে ঘৃণা। সে চতুর্দিকে তাকাল।

ঐ তো রয়েছে কুমীরের শরীর ধারী জলদেবতা সেবেক, আছে সাপের মাথা যুক্ত নেহেতফ, সারসপাখির মত দেখতে থত, বিড়াল মুখী বাস্তেভ।

এরা কেউ তাকে শান্তি দিতে পারছে না। বাতাসে ভাসমান ধূলিকণার মত ভাসছে তার শরীর হারা দেহটা। একদা রাতে অ্যান্নুবিসের পদতলে নিহত হয়েছিল হেনরী, তখন থেকে তার বিষাক্ত আত্মা মুক্তির সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

অ্যান্নুবিসের রক্তাক্ত পাথর চোখের কোণে কোণে এসে জমেছে রাগের ছায়া। সে মুখ খিঁচিয়ে বলছে—এই শতাব্দীর বুকে পোঁতা আছে আমাদের অভিশাপ। আমরা থুতু ছিটিয়ে চোখের জলে সিক্ত করে তোদের শতাব্দীকে করেছি হাহাকারের করুণ ধ্বনি। তোদের মুক্তি নেই।

কিন্তু যে নতুন শতাব্দী আসছে সেটা কি বহন করবে আমাদের সমবেত ঘৃণা? সেটাও কি তোমাদের প্রাণভরা অভিশাপে রক্তাক্ত

হয়ে যাবে? জবাব দাও যত প্রস্তরীভূত জানোয়ারের দল। বল, নীরব থেকো না, উত্তর দাও।

অ্যান্নুবিস আমন নেহেতফ নির্বাক। হেনরী মাথা খুঁড়ে মরছে কালো পাথরের পাদদেশে।

ক্লারা আবার নিজেকে দেখল। নীল জ্যোৎস্না প্লাবিত মধ্য রাত। আলৌকিক দর্পণে প্রতিফলিত তার অশরীরী দেহের ছায়া।

পরিপূর্ণা এক যুবতী। উৎরাই চড়াই দিয়ে গড়া বাসনার প্রতীক যেন। কিন্তু মুখটা বাঁকা, ঠোঁটের আড়ালে হিংস্র পশুর মত সাদা দাঁতের সারি। আতঙ্কে নিজেই কেঁপে ওঠে সে।

ক্লারা আজ চলমান আত্মা ভূত পিশাচী। সে উদ্ধত থাবা তুলে দেয় সুখী মানুষের বুকে। খাবলে ছিঁড়ে নেয় তার গা, কাঁচা অবস্থায় কচ কচ করে চিবিয়ে খায়।

প্রতি রাতে উষ্ণ মানব রক্ত না হলে ঘুম আসে না তার।

এমনভাবে সে মিটিয়ে চলেছে তার অনন্তকালের সঞ্চিত ক্ষুধা।

যেখানে ঝলসে ওঠে ঝলমলে রৌদ্র সেখানে ক্লারা নিয়ে যায় বাদল মেঘ। খুশী বালিকাকে করে রক্তস্রাবে যন্ত্রনাকাতর। গর্বিতা স্ত্রীকে গর্ভ যন্ত্রণায় অস্থির করে দেয়। তার আক্রোশে কিশোরী হয় ধর্ষিতা, বালিকার যৌবন ছিনতাই করে উঠতি মস্তান।

অসুখী আত্মাকে সে পরিপ্লাবিত করেছে মহাজগতে। ছায়াময় নীহারিকায় ছড়িয়ে দিয়েছে তার অতৃপ্ত চেতনার বন্যা। তার আদেশে পৃথিবীর বাতাস দূষিত হচ্ছে, দেশে দেশে শুরু হচ্ছে পারমাণবিক যুদ্ধ।

সে বহন করছে ভয়ঙ্কর শেষের সেদিন।

পপলার ও সীডার অরণ্যে তার নির্দেশে মধ্য দিনে আঁধার নামে। ঘূর্ণি আসে ঝড়ের আগে। তার ইঙ্গিতে মানুষ রোগাক্রান্ত হচ্ছে, ক্যান্সার আজও অজেয়।

তার খেলাতে লোক বিশ্বাসঘাতক হয়, ভুল করে, ব্যাভিচার আসে। তারই ঠোঁটের বাঁকা হাসিতে পৃথিবীর বুক থেকে শূন্যে উধাও হয় শেষ প্রেম।

মানুষ আজও ভাল হতে চায়। যখন ইস্ট নদীর সোনালী জলে দেওদারের ছায়া কাঁপে, যখন রুর‍্যাল ট্রা-লা-লা ভাঁজতে ভাঁজতে স্কুলের নীল ইউনিফর্ম পরা মেয়ে বাড়ী ফেরে, নীল পাহাড়ে নীল দুপুরের ছায়া পড়ে, তখন পৃথিবী সাজে মোহিনী রূপে।

কিন্তু সমস্ত নীল শুতে নিয়ে আকাশ কালো হয়ে যায়। সুর ভুলে কিশোরী নিজেকে অসভ্যের মত সাজায়। শরীর দুলিয়ে ক্ষুধা মেটাতে দাঁড়ায় হাই ওয়েতে।

এর নাম বিকৃতি, এটা জীবন নয়।

ক্লারা যেন রেটিনা রিফ্লেক্স ক্যামেরাতে পৃথিবীর ছবি তুলে রাখবে।

তার অ্যালবামে মুখের কোন ছবি থাকবে না। সেখানে থাকবে অত্যাচার, ব্যাভিচার, অনাচারের ছবি। কোথায় প্রেমিককে হত্যা করা হয়েছে, কোথায় ধর্ষিতা হয়েছে জননী এই সব জঘন্য ছবিতে ভরা থাকে তার কালো অ্যালবামে।

তাদের মধ্যে নিঃশব্দ বাদুড়ের মত ডানা মেলে উড়ছে ক্লারা। স্প্যানিশ প্যাটার্নে নির্মিত সুপ্রাচীন গীর্জাটার ভাঙা খিলানের কোণে অন্ধকারে বাসা বানানো কালো মাকড়সা।

পাকাস দ্বীপের গাছের ডালে ঝুলবে রক্ত খেকো শয়তান। রাতের অন্ধকারে যে ভাসমান জাহাজের বুকে ঘুমন্ত নাবিকদের দেহ থেকে নিঃশেষে পান করবে রক্ত।

তারই নির্দেশে কুমারী কন্যার গর্ভে আসবে ভ্রূণ। অ্যাবরসন করতে গিয়ে মারা যায় মাতা। তখন রক্তাক্ত ভ্রূণকে সমাধি দেওয়া হবে অন্ধকারে।

অসীম আকাশের অন্তরালে জোৎস্নার বাঘবন্দী খেলা। নৈঃ-শব্দ্যের মধ্যে শিশিরে শোয়ানো থাকবে তার দেহ।

ক্লারা এসে ডানা বিস্তার করবে। গ্রাস করবে কুমারী মাতার অস্তিত্ব। আদিম হিংস্রতায় ভরে যাবে তার মন। উৎকণ্ঠিত আর্তনাদ এসে থেমে থেমে বাজতে থাকবে।

তার প্রভাবে পৃথিবীর মাটির নীচে কাঠের কফিনে ঘুমন্ত ভ্যাম-পায়ারদের ঘুম ভাঙবে। অনেক পিপাসা নিয়ে তারা রক্ত পানে মাতাল হবে। তাদের বিকীর্ণ শ্ব-দণ্ডে কি ভয়াবহ অভিলাষ। দাঁতের ডগাতে বিস্তৃত লালসা।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলতে থাকবে অতৃপ্ত আত্মার রক্ত-তিয়াস।

তারপর কোন এক রাতে প্রচণ্ড ঝড় উঠবে পৃথিবীতে।

ঝোড়ো হওয়া এসে আলোড়ন তুলবে। মাথা ঝাঁকড়া গাছেদের পত্র-প্রশাখারা ক্ষ্যাপা জন্তুর মত মুখ ব্যাদান চীৎকার করতে করতে মাথা নীচু করে তীক্ষ্ণ শিং নেড়ে ছুটে আসবে।

ভূগর্ভে জমাট বাঁধা ক্লেদাক্ত মৃত্তিকার ঘুম যাবে ভেঙে।

ভৌতিক জগতের ভাসমান আত্মার আলোড়ন যেন বুক চাপা আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত।

তখন ক্লারার দ্বিখণ্ডিত মূর্তি ঝুলবে পাইনের ডালে।

টপ টপ করে রক্ত ঝরবে। মরু শৃগাল এসে শুকনো জিভে পান করবে ঐ রক্ত।

ক্লারার গোটা শরীরে বিষাক্ত ঘা হবে। মাছি বসবে; রক্ত পড়বে। দেহটা বিশ্রীভাবে পুড়ে যাবে তার। বুকের চামড়া এমনভাবে কুঁচকে যাবে যে চেনা যায় না।

কোটরে উধাও চোখ। পুঁজ গড়াচ্ছে, খিচুনি হচ্ছে।

থেকে থেকে প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়বে। ঝলসানো বরাভয় এসে গ্রাস করবে সভ্যতা। মানুষের অজানা রোগ নেমে আসবে চার পায়ে।

লুইজ্যা ককিয়ে কাঁদবে। অ্যানিলিয়ার চোখের জল শুকিয়ে যাবে।

আর লুসি আবার চৌদ্দ বছরের কিশোরী হয়ে যাবে।

অ্যানুবিসের বারো ফুট লম্বা মূর্তির সামনে শোয়ানো থাকবে হেনরীর ভয়ার্ত্ত দেহ। চোখে রক্ত আভা, হাত পা শক্ত।

শোয়ানো থাকবে লুসি। বিকৃত লালসা কাতরপ্রেত কিশোরী।

হাহাকার করে ঘুরবে ক্লারা। ঘুরবে জীবনহারা জীবন্তের সন্ধানে।

ক্লারা আবার নিজেকে দেখল, মলিন আয়নাতে প্রতিফলিত তরে বিশীর্ণ দেহ।

চোখেয় কোণে চিক চিক করছে রক্তাক্ত অশ্রু।

## স্বপ্নভিলার মেয়ে

এখানে আমরা ভাল আছি, যদিও ভোরের অজস্র সোনালী আলো তার ঝরণা ধারায় আমাকে স্নান করায় না, যদিও শেষ রাতের বাতাস এসে আমার চুলকে কাঁপায় না কিন্তু বিবর্ণ ম্লান জ্যোৎস্নায় মৃত্যু আর বিভীষিকার মধ্যে বেশ ভালই আছি আমি! এখন আমার শরীরী সত্তা হারিয়ে গেছে, পড়ে আছে হাড়ের খাঁচাতে বন্দী অভিশপ্ত আত্মা। সেই অতৃপ্ত আত্মা মাঝে মাঝে নিশীথ রাত্রে বাতাসে ভর রেখে হাজির হয় পার্থিব জগতে।

আকর্ষণ করে জীবিত মানুষকে। কুকুরের চীৎকার অথবা বাদুড়ের ডানা ঝাপটানোর মধ্যে আমার ক্রন্দনরত মৃত আত্মা জীবন্ত মানুষকে গ্রাস করতে চায়।

কেননা অনেক অতৃপ্ত বাসনা নিয়ে আমার মৃত্যু হয়েছে। যন্ত্রণা আর আতংকে আমার সমস্ত চেতনা আচ্ছন্ন হয়ে যাবে, কিন্তু তার মধ্যে আমি শুনতে পাই আমার মৃতা মা অ্যানিলিয়ার সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর।

আমি বিশ্বাস করি যে বাতাসে ভাসমান অদৃশ্য কণার মধ্যে বেঁচে আছেন আমার মা।

এই নির্জনে সঙ্গী আমার শীতল পরিবেশ। সঙ্গী আছে মৃতদেহের উগ্র গন্ধ। শুধু কি আমি? এখানে বাতাসে ভর রেখে ঘুরে বেড়ায় আমার মত অনেক অশরীরী আত্মা।

জানি এখানেই কোথাও আছে আমার বাবা হেনরী আর জীবন্ত পিশাচ ক্লারা। এখন আর কারো প্রতি এতটুকু ভালবাসা অবশিষ্ট নেই আমার মনে। শুধু প্রতিশোধের স্পৃহাতে কেঁপে উঠতে চাই।

তবু কেন মৃত্যুলীনা আমার মুখে অথবা নিদ্রালয়া আমার করপুটে বিয়োগান্ত প্রেম নীরবে আসে?

সমুদ্র ঝিনুকের মত বড় দুটি চোখের পাতা যখন ক্লান্তিতে বুজে আসে তখন সেই অনন্ত প্রেম বুঝি পুরুষ হয়ে আমার কানে বলতে চায়—দুঃখ পেয়ো না লুসি। পার্থিব জীবনে আছে শুধু বীভৎস দুঃস্বপ্ন আর দুঃসহ যাতনা। তার চেয়ে এ জীবন অনেক ভাল। শরীর না থাকে, আত্মা আছে, জীবন না থাক, মৃত্যু আছে।

কতবার মনে হয়েছে আবার যদি জন্ম হয়, তবে আমি যেন আমার দুঃখী মা অ্যানিলিয়ার কন্যা হয়ে জন্মাতে পারি। এবং সেই অনাগত জীবনে আমার দেহকে ঢেকে রাখুক চামেলি সৌরভ।

আমি যেন সেই জীবনে মৃত্যুর উদ্যত তর্জনীকে উপেক্ষা করে হতে পারি স্বপ্নভিলার মেয়ে। মৃত্যু যেন আমার কাছে নীরবে পরাজিত হয়।

জানি না সে জীবন আমি কোনদিন পাব কিনা, যদি নাও পাই, তার জন্যে দুঃখ নেই। এই অন্ধকারে, সকলের অজ্ঞাতে কাটুক আমার অভিশপ্ত আত্মার অনন্ত রাত্রি।

প্রেম? আমি তার মুখ দেখিনি। জানিনা পুরুষের আলিঙ্গন রক্তের মধ্যে কি আবেশ এনে দেয়। জানিনা চুম্বন আনে কত আনন্দ আর সহবাসের শেষ মুহূর্তে ঝরে যায় শিহরণ।

আমার গেল বছরের জীবনে পুরুষ ছিল দূরের দ্বীপের মত। যাদের সংস্পর্শে আমি এসেছি তারা দিয়েছে শুধু যন্ত্রণা।

কিন্তু মৃত্যুর পরে অনেক শান্ত যুবককে দেখে আমার মনে হয়েছে ফিরে যাই পার্থিব জীবনে। আবার নতুন করে শুরু করি কান্না হাসির দিনগুলো।

যখন আমি পলকে দেখি, উইলো বনে আর্তনাদ তোলা বাদল রাতে সে অসহায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। রীমা হয়ে আমি তাকে নিয়ে আসি কান্নাকুঠিতে।

তারপর প্রচণ্ড ভয় পেয়ে সে মরে যায়। গহন গিরিখাদে তার ভয়ার্ত্ত দেহটা পুঁতে দিতে দিতে আমি ভেবেছিলাম, যদি আমার আবার জন্ম হয়।

টমাস মুরকে রাতের পর রাত ধরে আচ্ছন্ন করেছি ভৌতিক মায়াজালে।

তিনটি অভিশপ্ত জীবনের কালো ছায়া এসে তাকে গ্রাস করেছে। প্রতিরাতে সে শরীরের তৃষাতে কাতর হয়ে অপেক্ষা করত আমার জন্যে।

আমি কিন্তু তাকে দিয়েছি বিষাক্ত উষ্ণতা। আমার মাতাল রঙে তাকে রাঙিয়ে নিয়ে গেছি মৃত্যু অভিসারে। কখনো আগাথা, কখনো সেইবা, আবার কখনো মেরিয়া হয়ে আমি ভয় দেখিয়েছি তাকে। এঁকেছি মৃত্যুর মলিন চিত্র।

কিন্তু এমন ভাবে ছলনার মুখোসে মুখ ঢেকে তার সামনে এসে আমি কি তাকে হেলেনার মত ভালোবেসে ফেলিনি ?

হেলেনা, যার নাম সে মনে আনতে পারতো না। যে তাকে ব্যথা দিয়ে চলে যায়।

আমার লোভী আত্মা সুখী গৃহবধূ হেলেনাকেও গ্রাস করেছিল।

হয়তো মনের অজ্ঞাতে ছদ্মবেশের আড়ালে মধ্য রাতে আমার মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসতো হেলেনা। টমাসের মনে পড়ে যেতো দূর শৈশবের রোজ মেরী পাপড়ি খসানো দিনগুলো।

তাই অত সহজে সে আমার ওপর অর্পন করে তার জীবন।

প্রেমকে সামনে রেখে আমি একদিন তাকেও মেরে ফেললাম।

তারপর অগাসটো। সবল চেহায়ার সূর্যতৃপ্ত লোকটিকে আমি দিয়েছি ভয়াল অনুভবের শীতল শিহরণ। তাকে রক্তাক্ত করেছি তীক্ষ্ণ কাঁটার চাবুকে! তৃষিত জিভে চেটেছি তাজা রক্ত।

এসব আমার মনের মধ্যে মিছিল করে এগিয়ে চলে!

এত পুরুষ আমার হাত থেকে নির্দ্বিধায় পান করেছে মৃত্যু সুধা। শরীরের লোভে ডুব দিয়েছে অনন্ত সাগরে। রমণীরা ইচ্ছে করলে যেকোন পুরুষকে করে তুলতে পারে তার হাতের পুতুল। হতে পারে তার নির্জন নিয়তি!

কিন্তু এমনভাবে একটির পর একটি হত্যার মধ্যে দিয়ে আমি ছুঁতে চেয়েছি বহু ইপ্সিত প্রেমকে?

যে প্রেম আমার চোদ্দ বছরের জীবনটাকে রঙে রূপে রসে ভরিয়ে তুলবে সেই প্রেম আমাকে দূর হতে হাতছানি দিয়ে ডেকেছে। আঙুল স্পর্শে তুলেছি ঝড়, শরীরকে কঠোর হাতিয়ার করে কপালে এঁকেছি রক্ত চুম্বন। কিন্তু প্রেমকে আমি দেখতে পাইনি।

আজ আমার মনে হয় সে যেন শেষ রাতে ঝলসে ওঠা আকাশ, সে যেন মৃত্যু, যেন নিদ্রা!

তাকে আমি চিনতে পারলাম না। হয়তো সে এসেছিল, চলে গেছে।

তবু কি কোনদিন তার সবুজ প্রান্তরে ফিরতে পারব আমি? কোনদিন?

না, এবার থেকে সুখ দেবে উৎকট শরীর বিলাস। জ্বালা হলে নিজের দেহে খুঁজে নবো তৃপ্তি, নিজের সাথেই চলবে আমার অন্ত-বিহীন শৃঙ্গার।

পুরুষ জাতটাকে আমি অবজ্ঞা করি, মেয়েদের প্রতি আমার হৃদয়ে ঘৃণা।

তাই নিজের সঙ্গে চলবে আমার ঈর্ষা ঈর্ষা খেলা। ইচ্ছে মতো

লোভী শরীরটাকে লেহন করবো, আদর দেবো আলিঙ্গন করবো, চুমুতে চুমুতে ভরিয়ে দেবো।

তারপর হয়তো মাটির নীচে অন্ধকারে শীতলতার মধ্যে প্রাণহীন প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ থেকে, শিলীভূত কণাতে পরিণত হতে হতে আমি ভাববো ইচ্ছেগুলোকে জড় করলে একটা মুখ, ভাবনাগুলোকে এক করলে তার স্মৃতি, দুঃখগুলো মিশে গেলে আমার প্রেম............

তখন তোমাদের ভালোবাসার পৃথিবীতে বিকেলের রৌদ্রে গোলাপের রেণু ভাসবে, অরণি আগুনে দগ্ধ হবে পাপড়ি, নীলিম মেঘে ভালোবাসার হলুদ পাখি ডাকতে ডাকতে উড়বে ......

তখন আমার সামনে এসে দাঁড়াবে অ্যানুবিসের শৃগাল মুখ। বলবে—আমি তোমাকে নিতে এসেছি লুসি।

সমাপ্ত